বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটক
(১৯৪৭ - ১৯৯০)

M.Phil.

রেহানা হোসনে আখতার

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

জুন ২০০০

RB
B
891.442009
AKB

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটক
(১৯৪৭ – ১৯৯০)

রেহানা হোসনে আখতার

Dhaka University Library
382694

৩৮২৬৯৪

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

জুন ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রেহানা হোসনে আখতার কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটক (১৯৪৭ – ১৯৯০)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

১৪.০৬.২০০০

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা ৪

অবতরণিকা ৫

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ঐতিহাসিক নাটক : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বিভাগ-পূর্ববর্তী বাংলা ঐতিহাসিক নাটক ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিকান্দার আবু জাফর ১৯

তৃতীয় অধ্যায়

মুনীর চৌধুরী ২৮

চতুর্থ অধ্যায়

আসকার ইবনে শাইখ ৩৫

পঞ্চম অধ্যায়

সাঈদ আহমদ ৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৈয়দ শামসুল হক ৬২

সপ্তম অধ্যায়

মামুনুর রশীদ ৭৮

উপসংহার ৮৭

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি ৯০

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

আমার এম. ফিল. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটক (১৯৪৭-১৯৯০)'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে আমি এম. ফিল. কোর্সে নিবন্ধন লাভ করি এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক-এর কাছে এম. ফিল. প্রথম পর্বের কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর অনাবিল আন্তরিকতা, সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রাজ্ঞ নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মকে সহজসাধ্য করে দিয়েছে। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত দিয়ে প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেন প্রমুখ আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এইসব শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সময় বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি নাট্যকার মমতাজউদ্‌দীন আহমদ এবং মামুনুর রশীদ-এর কাছ থেকে। নাট্য-সংগঠক রামেন্দু মজুমদারও আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক ড. সুকুমার বিশ্বাসের সহযোগিতার কথাও এ-প্রসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ-সূত্রে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা শ্রী রতনকুমার দাসের সহযোগিতার কথাও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটক (১৯৪৭–১৯৯০)' শিরোনামাঙ্কিত বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটকসমূহের বিষয় ও শিল্পরূপ আলোচিত হয়েছে। সর্বমোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে পরিকল্পিত হয়েছে এ-অভিসন্দর্ভের অবয়ব। এ-ছাড়াও রয়েছে 'অবতরণিকা' এবং 'উপসংহার' অংশ। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে দু'টি পরিচ্ছেদ – (ক) 'ঐতিহাসিক নাটক : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' এবং (খ) 'বিভাগ-পূর্ববর্তী বাংলা ঐতিহাসিক নাটক'। প্রথম পরিচ্ছেদে ঐতিহাসিক নাটকের শিল্পরূপগত বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। এ-পরিচ্ছেদটি রচিত হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটকের জগতে অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে।

দ্বিতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশের মোট ছয়জন নাট্যকারের আটটি ঐতিহাসিক নাটক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখকনামসহ আলোচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলো হচ্ছে — সিকান্দার আবু জাফর — *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* ; মুনীর চৌধুরী — *রক্তাক্ত প্রান্তর* ; আসকার ইবনে শাইখ — *রক্তপদ্ম, অগ্নিগিরি* ও *অনেক তারার হাতছানি* ; সাঈদ আহমদ — *শেষ নবাব*, সৈয়দ শামসুল হক — *নূরলদীনের সারা জীবন* এবং মামুনুর রশীদ — *লেবেদেফ* । নাটকসমূহ আলোচনার সময় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং নাট্যকারের মৌল জীবনার্থ সন্ধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিহাসের কোন ঘটনা কিংবা ঐতিহাসিক কোন চরিত্রের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা নাট্যকার নির্দেশ করতে পেরেছেন কিনা — সেটিও ছিল আমাদের গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্যে ইতিহাসের সঙ্গে সমকালীন জীবনচেতনা বিমণ্ডিত হয়ে যায়, এবং সেখানেই তার কালোত্তীর্ণ সার্থকতা। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং সমকালের মধ্যে কোন যোগসূত্র রচিত হয়েছে কিনা, তা-ও আমরা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। অভিসন্দর্ভের 'উপসংহার' অংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে সমগ্র আলোচনার সারাৎসার।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে ঐতিহাসিক নাটকসমূহের বিষয় (content) আলোচনার পাশাপাশি শিল্পরূপও (form) আলোচিত হয়েছে। শিল্পরূপ আলোচনার সময় আমরা প্রধানত নাটকসমূহের অঙ্ক-বিভাজন এবং ভাষা ও সংলাপের দিকে দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভভুক্ত আটটি নাটক ছাড়াও বাংলাদেশের নাট্যকাররা ইতিহাসের কোন অনুষঙ্গ বা ঐতিহাসিক কোন চরিত্র নিয়ে আরো কিছু নাটক রচনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সাহিত্য হিসেবে সে-সব নাটক ন্যূনতম মান অর্জন করতে পারেনি বলে আমরা সচেতনভাবেই তা বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোচনার জন্য গ্রহণ করিনি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটকসমূহের মূলপাঠ গৃহীত হয়েছে যে-সব গ্রন্থ থেকে সংস্করণসহ তার তালিকা দেওয়া হয়েছে 'পরিশিষ্ট' অংশের গ্রন্থপঞ্জির 'মূলগ্রন্থ' উপশিরোনামায়। উদ্ধৃতি ব্যবহারের সময় আমরা অক্ষুণ্ন রেখেছি লেখকের মূল বানানরীতি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক নাটক : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

বিভাগ-পূর্ববর্তী বাংলা ঐতিহাসিক নাটক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক নাটক : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

সাহিত্যের নানাবিধ রূপকল্প — কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি। নাটককে প্রাচীন ভারতে কাব্য বলা হত। দৃশ্য-কাব্য এবং শ্রাব্য-কাব্যের মিলনে গড়ে ওঠে নাটক। রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে অভিনয়-শিল্পীদের সাহায্যে মানবের চলমান জীবনের সুখ-দুঃখকে যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন তাকে নাটক বলে।

অনুকরণের সহজাত প্রবৃত্তি হতে নাটকের উৎপত্তি। মানুষ অপরের কথা, ভাব ও ভঙ্গি লক্ষ করে তা অনুসরণ করতে ভালোবাসে। এই প্রবৃত্তি আদিম মানুষ হতে চলে আসছে। প্রাচীন কালের মানুষেরা কোনো উপাসনালয়ের প্রাঙ্গণে সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে তাদের অনুকরণ প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করত। এভাবে ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ঘটেছিল নাট্যকলার উদ্ভব। গ্রীস দেশে Dionysus দেবতার পূজায় যে সঙ্গীতের (Dithyramb song) প্রচলন ছিল তা থেকেই ট্রাজেডীর উৎপত্তি এবং ঐ দেবতার উৎসবের হাস্য-পরিহাসযুক্ত শোভাযাত্রা ও সঙ্গীত হতে কমেডির সৃষ্টি। ভারতীয় নাটকের মূলও প্রাচীন ধর্মের মধ্যে নিহিত। কথিত আছে, ব্রহ্মা 'নাট্যবেদ' নামক পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করেন। চতুর্বেদ হতে নানা উপাদান সংগ্রহ করে তিনি এই নতুন বেদ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা এই বেদ তাঁর শিষ্য ভরত মুনিকে শিক্ষা দেন। ভরতের দ্বারা নাট্যবেদ জগতে প্রচার লাভ করে।[১]

নট, নাট্য, নাটক শব্দগুলোর মূল হল নট। আর এই নট-এর অর্থ হল নড়াচড়া করা, অঙ্গ চালনা করা। আবার ইংরেজি Drama শব্দটির মূলে আছে গ্রীক শব্দ Draein। এই মূল শব্দের অর্থ হল 'to do' (করা)।[২]

Dhaka University Institutional Repository

নাটক মানেই হল নড়াচড়া করা, অঙ্গ চালনা করা বা কিছু করা। নাটকে মানব-জীবনের কোন কর্মের অনুকরণ শিল্পরূপ লাভ করে। নাটক মানুষ ও তার সমাজের বিচিত্র ঘটনাকে বিধৃত করে। নাটক হল দর্পণ, মানুষের দর্পণ, সমাজের দর্পণ।

বৈদিক কাল থেকেই ভারতীয় নাটকের ক্ষীণধারা আমরা লক্ষ করি। বেদের অনেক স্ত্রোত্র কথোপকথনের আকারে রচিত। এ-সব স্ত্রোত্রই নৃত্যগীতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিয়মানুবন্ধ নাটকে পরিণতি লাভ করেছে বলে অনেক গবেষক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বৈদিক যুগের পর *রামায়ণ* এবং *মহাভারত*-এর অনেক স্থলেও নাটকের বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। এ থেকে ধারণা করা যায় তৎকালে নাটক ও নাটকের অভিনয় প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক কিথসহ অনেক গবেষক বলেছেন যে, *রামায়ণ* এবং *মহাভারত*-এর অংশবিশেষের আবৃত্তি হতে ক্রমে নাটকের উদ্ভব হয়।[৩]

নাট্য-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের জীবন, সমাজ, মানুষের ইচ্ছা, আনন্দ বা বেদনা অভিনীত হয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে গ্রীক-নাট্য। সে-সময় বিরাট মঞ্চের চারদিকে পাহাড়ের সিঁড়িতে বসে হাজার হাজার দর্শক মুগ্ধ হয়ে প্রমিথিউস বা রাজা ইডিপাস কাহিনীর নাট্যরূপ দেখতেন। এই উপমহাদেশেও প্রায় দু'হাজার বছর আছে নাট্যমঞ্চ ছিল। এই মঞ্চে অভিনীত হয়েছে সংস্কৃত নাটক। *শকুন্তলা, স্বপ্নবাসবদত্তা* প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন প্রাচীন ভারতের দর্শক।

বাংলাদেশেও বহুকাল আগে থেকেই নাটক অভিনয়ের প্রচলন ছিল। রাধাকৃষ্ণের পালা, রামায়ণ, মহাভারতের পাঁচালি, মঙ্গলগীতিকা প্রভৃতি বিষয় গান এবং অভিনয়ের সাহায্যে খোলামঞ্চে উপস্থাপন করা হত। কালক্রমে প্রাচীন ও মধ্যযুগের এ-সব নাট্য-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার থেকেই আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব। আধুনিক নাট্য-রূপকল্প সৃষ্টিতে ইউরোপীয় নাটকও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সমালোচকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে নাটকের বিভিন্ন রকমের শ্রেণীকরণ করেছেন। এর মধ্যে বিষয়বস্তু বিচারে নাটকের শ্রেণীকরণ বহুল পরিচিত। বিষয়-বিচারে নাটকের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঐতিহাসিক নাটক।

ঐতিহাসিক কথাটি ব্যাপক অর্থদ্যোতক। ঐতিহাসিক যুগের বিখ্যাত ঘটনা যা জাতীয় ইতিহাসে স্থান পায়, তাকেই ঐতিহাসিক বলা যায়। সে-ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক ঘটনাই নয়, রাজা বা রাষ্ট্রনায়কদের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের বর্ণনাই নয় ; ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি বিষয়সমূহও এর আওতাভুক্ত। এই দৃষ্টিকোণে স্মরণীয় রাজনৈতিক ঘটনা, অর্থনৈতিক আন্দোলন,

Dhaka University Institutional Repository

সমাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মনৈতিক আন্দোলন যা-ই জাতির ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তাকেই ঐতিহাসিক বলা যায়।

সেরূপে উল্লিখিত ক্ষেত্রে যে যে ব্যক্তি জাতীয় কাজে স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। রাজা বা রাষ্ট্রনায়করা যে-অর্থে ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক আন্দোলনের নেতা বা সাধকও সেই অর্থে ঐতিহাসিক, অর্থাৎ জাতির কাছে স্মরণীয়। যে জীবনের ঘটনা বা জীবনী সকলেরই সুবিদিত, তার ইতিহাস বাদ দিলে জাতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে।[৪]

এক কথায় বলা যায়, ইতিহাসের ঘটনাকে আশ্রয় করে যে নাটক রচিত হয় তাই ঐতিহাসিক নাটক। জাতীয় ইতিহাসের কোন বিশেষ চমকপ্রদ বা উত্তেজনাকর ঘটনা যখন নাট্যকার নাটকে রূপদান করেন তখনই তা হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের সত্যকে অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে — তা না হলে তা ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে বিবেচ্য হবে না। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস বহির্ভূত কোন ঘটনা বা চরিত্র আনা যাবে না, তা নয়। কারণ নাটক ইতিহাস নয়, সাহিত্য। এখানে থাকতে হবে দর্শকের প্রাণের খোরাক। নাট্যকার তাই ইতিহাসের মূল বিষয় বা সত্যকে অক্ষুণ্ন রেখে নাটকের প্রয়োজনে কল্পনার রং-রস সংযোজনের অধিকার পান। এখানে মনে রাখতে হবে নাটক হুবহু ইতিহাস হতে পারে না, আবার ইতিহাসও নাটক নয়। তাই দেখা যাচ্ছে, ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস প্রাধান্য পাবে, তবে তা তার সাহিত্যমূল্যকে ক্ষুণ্ন করে নয়।

ইতিহাস ও সাহিত্য প্রত্যয়দ্বয় সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তারপরও এই দু'টি বিষয়ের সমন্বয় সাধন করে ভিন্ন একটি মাত্রা দান করা যায়। ঐতিহাসিক বর্তমানের কোন্ প্রশ্ন মনে রেখে অতীতের বিশেষ কোন ঘটনা রূপায়িত করবেন এ-ব্যাপারে নাট্যকারই মনঃস্থির করেন। সেই প্রশ্নের উত্তর কী হবে সে-ব্যাপারে ঐতিহাসিকের কোন স্বাধীনতা প্রায় নেই, অথচ সাহিত্যিকের রয়েছে অসীম স্বাধীনতা। এখানেই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, আর সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শক্তি।[৫] ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ। অপরদিকে সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্যিকের ভাব-কল্পনার শিল্পসঙ্গত প্রকাশ।

ইতিহাস কোন-না-কোন ভাবে অতীতকে আশ্রয় করে। সেই অতীত থেকে ইতিহাস তথ্য সঞ্চয় করে। সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করে সাহিত্য।

ইতিহাস পুরোপুরি বিজ্ঞান হতে পারে না। কারণ ইতিহাসের তথ্য এবং বিজ্ঞানের তথ্য একরকম নয়। তাছাড়া সাধারণ নিয়ম তৈরী করতে গেলে যত তথ্য লাগে, তার সামান্য অংশও ঐতিহাসিকের ভাগ্যে জোটে না। এ ছাড়াও অন্য একটি সমস্যার কথা

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইতিহাস মানুষের, কিন্তু ঐতিহাসিক মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। সাহিত্য চিরকালই এই কাজটি করেছে, বর্তমানেও করছে। সাহিত্যে যে-সত্যের প্রকাশ, ঐতিহাসিকের কাছে তা ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু সাহিত্যিকের স্বাধীনতা ঐতিহাসিক স্বেচ্ছাচার বলে বাদ দিয়েছেন।[৬]

নাট্যকার ইতিহাসকার নন। তাঁর কাজ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে, ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জীবনের যে রস-রূপ নিহিত আছে সেই রস-রূপকে ফুটিয়ে তোলা। সমাজ-জীবনের বা ব্যক্তি-জীবনের ইতিহাস দ্বারা নাট্যকারের কল্পনা নিয়ন্ত্রিত একথা সত্য, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পরিধির মধ্যে কল্পনার স্বাধীন সাধনার অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে। ইতিহাস নাট্যকারকে আলম্বন বিভাব (পাত্র-পাত্রী) ও উদ্দীপন বিভাব (দেশ-কাল পরিস্থিতি) যোগালেও, নাট্যকার নাটকের আসলটুকু অর্থাৎ অনুভাবাদি নিজেই সৃষ্টি করে থাকেন। আর সেই সৃষ্টির মহিমাতেই নাট্যকারের কবিকীর্তি। তেমনি যে যুগের ইতিহাস বা জীবনকে তিনি রূপ দেবেন সেই বিশেষ যুগের আচার-বিচার-রীতি-নীতি, বাস্তববোধ প্রভৃতিকেও অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করবেন। যে নাট্যকার তাঁর রচনায় যুগের আবহাওয়াটি যত নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করতে পারেন, ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে তাঁর সৃষ্টির মর্যাদা তত বেশী।[৭]

বর্তমানের মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ সরে না গেলে সাহিত্যে ইতিহাস আসে না। যদি বলা হয় ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে মঞ্চসজ্জা করলেই রচনায় অতীতের আবির্ভাব ঘটে না — বক্তব্য ভুল হবে না। কিন্তু আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। যদি কোন বিরল সাহিত্যিক অন্যযুগের মনকে তাঁর রচনায় ধরতে পারেন, পাঠক যদি সেই মনকে পৃথক বলে চেনেন কিন্তু স্বাভাবিক বলে মানেন, তা হলে সেই সাহিত্য নিঃসন্দেহে ইতিহাসধর্মী। ঐতিহাসিক নাটকে নাট্যকারকে ইতিহাস ও কল্পনার আনুপাতিক সম্পর্ককে রক্ষা করতে হয়। ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে তিনি মূলত শিল্পিত করতে চান বর্তমান কালের মানবজীবনের বিশেষ কোন মুহূর্ত বা অনুষঙ্গকে। ইতিহাসের কাঠামোতে বর্তমানের জীবনবেদ সঞ্চারিত হলেই ঐতিহাসিক নাটক সার্থকতা বিমণ্ডিত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস* (কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ - ১৯৭০), পৃ. ১-২

Dhaka University Institutional Repository

২. সিকান্দার আবু জাফর, *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (ঢাকা : বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, তৃ. সংস্করণ - ১৯৯৬), পৃ. ১০

৩. অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত।

৪. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব-মীমাংসা,* (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর ১৯৭৮), পৃ. ৪৬৩

৫. অশীন দাশগুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য,* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৯), পৃ. ২৩

৬. ঐ।

৭. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬-৬৭

৮. অশীন দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিভাগ-পূর্ববর্তী বাংলা ঐতিহাসিক নাটক

বাংলা নাটকের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকা, আখড়াই, গম্ভীরা প্রভৃতি সাহিত্যকর্মে নাটকের নানা বৈশিষ্ট্যের কথা গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আধুনিক অর্থে নাটক আমরা প্রথম পাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

সংস্কৃত নাটকের আদর্শ ও ঐতিহ্য[১] এবং ভারতের নাট্যশাস্ত্র থাকলেও বাংলায় উনিশ শতকের আগে কোন নাটক লেখা হয়নি। তখন বিনোদনের জন্য প্রচলিত ছিল ঝুমুর, কৃষ্ণযাত্রা, শিব বা শক্তি মাহাত্ম্য, রামায়ণ কথা, কবিগান, তরজা, পাঁচালি প্রভৃতি। "পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বলিত সংস্কৃত নাটক ধীরে ধীরে সাধারণ লোকের মুখের ভাষা ও তার দাবির কাছে নিষ্প্রভ ও প্রভাবহীন হ'য়ে পড়েছিল। তাই সর্বজনবোধ্য আমোদ-প্রমোদের দাবিতেই হয়ত সংস্কৃত নাটক তার স্থান হারিয়ে ফেলেছিল।"[২]

পৃথিবীর সব দেশেই নাটকের উৎপত্তি হয়েছে ধর্মানুষ্ঠানে নাচ-গান-আবৃত্তি ও স্তোত্র পাঠ থেকে। কিন্তু বাংলা নাটকের উপত্তির মূলে কোন ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপার ছিল না। তার কারণ এ-দেশে রয়েছে নাট্যচর্চার সুমহান ঐতিহ্য। দ্বিতীয়ত, উনিশ শতক ছিল নবজাগরণের কাল। তৃতীয়ত, ইংরেজরা এদেশে আসার পর কলকাতা শহরের পত্তন হয়েছিল। তখন তারা নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্য কলকাতায় রঙ্গালয় স্থাপন করেছিল। সেখানে অভিনীত হতো ইংরেজি নাটক। অভিনয় করত ইংরেজরাই। সাধারণ বাঙালিরা সেখানে প্রবেশ করতে পারতো না। ইংরেজরা যে রঙ্গালয় স্থাপন করেছিল তার নাম সাঁসূচী ও চৌরঙ্গী থিয়েটার। ইংরেজদের নাটক করার এই ধারা অনুসরণ করে প্রথম যিনি বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেন তিনি কিন্তু বাঙালি নন, তিনি একজন রুশ-পর্যটক। তাঁর নাম গেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেদেফ। তিনি ফরাসি লেখক

Dhaka University Institutional Repository

মঁলিয়ের-এর *Love is the Best Doctor* এবং ইংরেজি নাটক *The Disguise* বাংলায় অনুবাদ করেন। *The Disguise* ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর প্রথম অভিনীত হয়েছিল এবং দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়েছিল ১৭৯৬ সালের ২১ মার্চ। এরপর বাঙালিরা বিলেতি ধরনের রঙ্গালয় স্থাপন করে কখনো ইংরেজি নাটকের অনুবাদ, কখনো বিদ্যাসুন্দরের অনুবাদ মঞ্চায়ন করেন।

কিন্তু এইসব নাটকের মধ্যে যাত্রাপালার ঢঙই বেশী পরিলক্ষিত হয়। তবে বাঙালির প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। যাঁরা এ-ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন — প্রসন্নকুমার ঠাকুর (হিন্দু থিয়েটার), নবীনচন্দ্র বসু, আশুতোষ দেব, রামজয় বসাক প্রমুখ।

বাংলার প্রথম মৌলিক নাটক জে. সি. গুপ্তের *কীর্তিবিলাস* ও তারাচরণ শিকদারের *ভদ্রার্জুন*। এই নাটক দু'টি ১৮৫২ সালে রচিত হয়েছিল। *ভদ্রার্জুন* পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাটকটিতে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আছে। *কীর্তিবিলাস* নাটকেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বর্তমান। তবু *কীর্তিবিলাস*-ই প্রথম বাংলা ট্র্যাজেডি নাটক। সেই হিসেবে বাংলা নাটকের বিকাশের ইতিহাসে এই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার্য।

প্রথম দিককার বাংলা নাটকের মধ্যে বাঙালির বাস্তব জীবনের যে স্পন্দন দেখা যায়, পরবর্তী যুগে অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের যুগে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় — তখন পৌরাণিক বিষয়বস্তুই নাটকের উপজীব্য বলে গৃহীত হয়।[৩]

মাইকেল মধুসূদন দত্তই (১৮২৪-৭৩) বাংলা নাটকের ধারায় সর্বপ্রথম সংযোজন করেন ঐতিহাসিক নাটকের শিল্পরূপ। মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রীতিপদ্ধতির শৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে ইংরেজি নাটক অনুসরণে বাংলা নাটক লেখেন। *কৃষ্ণকুমারী*-ই (১৮৬০) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। টডের *রাজস্থানের ইতিহাস* গ্রন্থ থেকে তিনি আলোচ্য নাটকের মৌল উপাদান সংগ্রহ করেন। মধুসূদনের *কৃষ্ণকুমারী* নাটক বিষয় ও শিল্পরূপের দৃষ্টিকোণে বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল সম্পদ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম এবং প্রধান ঐতিহাসিক নাটক *পুরুবিক্রম* (১৮৬৪)। এছাড়া *সরোজিনী* (১৮৭৫), *অশ্রুমতী* (১৮৭৯) এবং *স্বপ্নময়ী* (১৮৮২) নামেও তাঁর তিনটি ঐতিহাসিক নাটক রয়েছে।

ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসেবে সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। *তারাবাঈ* (১৯০৩) তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। *সাজাহান* নাটক লিখে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়া *প্রতাপসিংহ* (১৯০৫), *দুর্গাদাস* (১৯০৬),

Dhaka University Institutional Repository

নূরজাহান (১৯০৮), *চন্দ্রগুপ্ত* (১৯১১), *সিংহল বিজয়* (১৯১৫) তাঁর অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯৩৭) ঐতিহাসিক নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে *অশোক* (১৯০৭), *চাঁদবিবি* (১৯০৭), *বাংলার মসনদ* (১৯১১) এবং *আলমগীর* (১৯২১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগের একজন বলিষ্ঠ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মঞ্চের সাথে তার যোগাযোগ থাকার দরুন তিনি মঞ্চের কলাকৌশল সম্পর্কে বেশ দক্ষতা অর্জন করেন। এই দক্ষতা তাঁকে মঞ্চ-সফল নাটক রচনায় সহায়তা করেছে। সংলাপ রচনায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্য দ্বারা আবেগ ও সংঘাত সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন কুশলী। আধুনিক নাটক ঘটনা বিপর্যয় অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সম্পন্ন এবং চরিত্রগুলি বিভিন্ন ভাবের আবর্তে পরিচালিত। শচীন্দ্রনাথের নাটকে এ আধুনিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট।[৪]

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সারা জাগানো ঐতিহাসিক নাটক *সিরাজদ্দৌলা* । বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবন-ট্র্যাজেডী নিয়ে গড়ে উঠেছে এ-নাটক। এ ছাড়াও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বেশ কিছু ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন — *রাষ্ট্রবিপ্লব*, *কামাল আতাতুর্ক*, *বাংলার প্রতাপ* ইত্যাদি। তাঁর *ধাত্রীপান্না* ঐতিহাসিক নাটকগুলোর মধ্যে অধিক সার্থক। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু রাজনৈতিক বা দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেন। তার মধ্যে *দেশের দাবী*, *নব-দেবতা*, *সংগ্রাম ও শান্তি*, *ভারতবর্ষ*, *এই স্বাধীনতা*, *সবার উপরে মানুষ সত্য* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪–১৯৭৮) ইসলামী জীবনচেতনার একজন সার্থক পুরুষরূপে নিজেকে নিবেদিত করেন। নাট্যকার হিসেবেও তিনি সার্থকতা লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটকগুলো হলো *কামাল পাশা*, *আনোয়ার পাশা*, *কাফেলা*, *ভিস্তি বাদশা*, *নিজাম ডাকাত* ইত্যাদি। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলোর ঘটনা এ-দেশীয় নয়। আধুনিক তুরস্কের নবজন্মের কথা এবং কল্যাণব্রতী কামাল পাশার জয়োচ্চারণ এ নাটকগুলোতে নতুনত্ব এনেছে। তৎকালে মুসলিম জাতীয় জাগরণের অনুপ্রেরণা ও আবেগাশ্রয়ী সংলাপের মধ্য দিয়ে এসব নাটকে ইব্রাহীম খাঁ মনেপ্রাণে মুসলিম পুনর্জাগরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩–১৯৫৩) মূলত একজন কবি। নাটক রচনাতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি বেশী সাফল্য লাভ করেছেন। *সরফরাজ খাঁ*, *নবাব আলীবর্দী*, *মসনদের মোহ*, *আনারকলি* তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক। *আনারকলি* ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত হলেও এটি

Dhaka University Institutional Repository

একটি প্রণয়মূলক নাটক। *সরফরাজ খাঁ* পঞ্চাঙ্ক নাটক। এই নাটকের কাহিনী পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। *মসনদের মোহ* নাটকটিতে রাজনৈতিক স্বার্থলোলুপতা, সংসার ও সমাজের বিভিন্ন বিষয় চিত্রিত হয়েছে।

আকবরউদ্দিনও (১৮৯৬–১৯৭৮) ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসেবে সাফল্য লাভ করেন। *সিন্ধুবিজয়* আকবরউদ্দিনের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু-বিজয়ের ঘটনা নিয়ে এ নাটকটি লিখিত হয়েছে। আকবর উদ্দিনের পরবর্তী নাটক *নাদিরশাহ* আফগান সম্রাট নাদির শাহের দিল্লী বিজয়ের কাহিনী নিয়ে লেখা। *মুজাহিদ* নাটকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-প্রতিষ্ঠাকালের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

ইব্রাহীম খলিল (জন্ম : ১৯১৬) বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। ইসলামের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় নিয়ে তিনি লিখেছেন 'স্পেন বিজয়ী মুসা'। ইব্রাহীম খলিল অত্যন্ত সচেতনভাবেই ইসলামের অতীত গৌরব গাঁথা স্বসমাজে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং সেদিক থেকে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রের উপযোগী সংলাপ সৃষ্টি করে প্রচারধর্মে সার্থকতা অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর নাটকে ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সেই আদর্শ সামনে রেখেই মুসলিম চরিত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন। ফলে তারা সকলেই একটি আদর্শের বাহন হিসেবে কাজ করেছে – রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে তারা উপস্থিত হয়নি।[৫] তাঁর *সমাধি* নাটকটি লোক-কাহিনীভিত্তিক হলেও এর মূলে রয়েছে ঐতিহাসিক পটভূমি। ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের দ্বারা বাংলার মানুষ কি নির্মমভাবে পীড়িত হয়েছিল তার ছবি ফুটে উঠেছে *ফিরিঙ্গী হার্মাদ* নাটকে। নূরজাহানের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিয়ে ইব্রাহীম খলিল রচনা করেছেন *নূরজাহান* নাটক। ইব্রাহীম খলিল রুচিবান শিল্পী ; সজীব মন ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও গভীর আত্মবিশ্বাস তাঁর রচনাকে দান করেছে নিটোল সৌন্দর্য। দেশ-কাল-মানুষ সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে কৌতূহলী ও সংবেদনশীল। তাঁর নাটকে একটি সতেজ প্রাণাবেগ ও নিবিড় রসবোধ বিকশিত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় ঐতিহাসিক নাটকের এই বিকাশের পটভূমিতেই বিচার্য বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাট্যধারা। ঐতিহাসিক নাটকের এই ঐতিহ্যের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাট্যধারা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা,* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৩৭৯), পৃ. ৩

২. ঐ, পৃ. ৫

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* – প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭০), পৃ. ১২

৪. নীলিমা ইব্রাহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১

৫. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা (১৯৪৭-১৯৭১),* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৮৯

৬. মুহম্মদ মজিরউদ্দিন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা,* (রাজশাহী : নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭০), পৃ. ৪৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিকান্দার আবু জাফর

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিকান্‌দার আবু জাফর

সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নাম। প্রগতিশীল ও সৎ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তাঁর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মাসিক 'সমকাল' (১৯৫৭) সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যম ছিলো অবিস্মরণীয়। তিনি অনেক গুণ সম্পন্ন একজন সাহিত্যিক। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা — যেমন উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক — সর্বোপরি অনুবাদক হিসেবেও তাঁর দক্ষতা অসামান্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সিকান্‌দার আবু জাফর একজন সাহসী সৈনিক। এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির অগ্রগতি ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে তিনি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত — একথা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে সিকান্‌দার আবু জাফর বলেন —

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিশ্চিত বিজয় লক্ষ্যে ধাবমান। এই সংগ্রাম গোটা জাতির সর্বাঙ্গীন সংগ্রাম। বাংলাদেশের মানুষের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি কোন কিছুই এই সংগ্রাম থেকে আলাদা নয়। বাংলার জনগণ এই কঠিন কঠোর সংগ্রামে বিজয় অর্জন করার জন্য তুলনাবিহীন আত্মত্যাগ করেছেন, করে যাচ্ছেন এবং করতে বাধ্য হবেন।[১]

সিকান্‌দার আবু জাফর মোট চারটি নাটক রচনা করেন। এগুলো হচ্ছে — ক. *মাকড়সা* (১৯৫০), খ. *শকুন্ত উপাখ্যান* (১৯৬২), গ. *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (১৯৬৫) এবং ঘ. *মহাকবি আলাউল* (১৯৬৬)।

সিকান্‌দার আবু জাফরের অন্যতম ঐতিহাসিক নাটক *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* । এটি চার অঙ্ক বিশিষ্ট একটি নাটক। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। বাংলায় তখন থেকে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে এবং পরবর্তীতে ইংরেজরাই এই দেশের শাসনভার গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করে। এই পটভূমিকেই কেন্দ্র করে *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* নাটকের কাহিনীর বিস্তার। ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে নাট্যকার তাঁর নিজস্ব কল্পনা মিশিয়ে এই নাটক রচনা করেছেন। নাট্যকার ভূমিকাতে বলেছেন —

১. সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি।

২. প্রকৃত ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজ-উ-দ্দৌলার জীবন-নাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি।

৩. ধর্ম ও নৈতিক আদর্শে সিরাজ-উ-দ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদ্‌গুণ এই নাটকে প্রধানত সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণাবলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।

সিকান্‌দার আবু জাফরের পূর্বে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শচীন সেনগুপ্ত সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটক রচনা করেছেন। নাট্যকারের মতে এ-সব নাটকে সিরাজ চরিত্রটির প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা প্রতিফলিত হয়নি। সিকান্‌দার আবু জাফরের সিরাজ একাধারে দেশপ্রেমিক, জাতীয় বীর। সিরাজ সাহসী যোদ্ধা, মানব প্রেমিক, চরিত্রবান, প্রেমময় স্বামী, স্নেহশীল পিতা, অনুগত সন্তান এবং একনিষ্ঠ ধার্মিক। সকল মহৎ গুণের প্রতীক সিরাজ-উ-দ্দৌলা।[২]

সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ — বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ (রাজত্বকাল : ১৭৪০-১৭৫৬) ছিলেন অপুত্রক। তাঁর তিন কন্যা — (১) ঘসেটি বেগম (মেহের উন নিসা), (২) শাহ বেগম, এবং (৩) আমিনা বেগম। জীবন সায়াহ্নে তিনি তার উত্তরাধিকারী হিসেবে কনিষ্ঠা কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজকে মনোনীত করেন। সে হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলা মসনদে বসেন। আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম সিরাজকে নবাব হিসাবে মেনে নিতে পারেন নি। এ উচ্চাভিলাষী মহিলার ইচ্ছা ছিল অযোগ্য, মদ্যপ শওকত জঙ্গকে (শাহ বেগমের পুত্র) ক্ষমতায় বসিয়ে নেপথ্যে থেকে তিনিই সাম্রাজ্য পরিচালনা করবেন। সিরাজ নবাব হওয়ায় এটা সম্ভবপর হবে না ভেবে তিনি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তার সাথে যোগ দিলেন নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খান। মীর জাফর আলীবর্দী খানের ভগ্নিপতি। আলীবর্দীর আমল থেকে তিনি প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে আসছেন। সিংহাসনের প্রতি তার প্রচণ্ড লোভ ছিল। তার সাথে যোগ দেয় জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতি স্বার্থপর সেনাপতি ও কর্মচারী।

নবাব দক্ষতার সাথে ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দী, শওকত জঙ্গকে পরাজিত ও ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করতে পারলেও পরবর্তীতে তা বজায় রাখতে পারেননি। শওকত

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গ নিহত হলে কুচক্রীরা মীর জাফরের নেতৃত্বে গোপনে ইংরেজদের সাথে হাত মেলায়। ইংরেজরা আগে থেকেই নবাবের পতনের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। কারণ সিরাজ ইংরেজদের ব্যবসার নামে সাধারণ মানুষকে শোষণ সহ্য করতেন না। ১৭৫৭ সালের জুনে ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনী পলাশীর প্রান্তরে নবাবের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখী হয়। ২৩শে জুনের যুদ্ধে মীর জাফর ও অন্যান্যদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নবাবের পরাজয় ঘটে। পরাজিত নবাব পাটনার পথে পলায়নরত অবস্থায় ধরা পড়েন এবং কারাগারে মীরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগের হাতে নিহত হন।

আলোচ্য নাটকে সিকান্দার আবু জাফর কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দুর্গ তৈরীর সময় থেকে সিরাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, তাদের কবল থেকে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম, পলাশীর প্রহসন ও সিরাজের পতন ইতিহাসের পটভূমিতে স্বাধীনতা ও জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করেছেন। সিরাজকে তিনি দেখেছেন ধর্ম ও নৈতিকতা বোধসম্পন্ন একজন সাধারণ মানুষরূপে। সিকান্দার আবু জাফরের *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* নাটকের প্রধান আকর্ষণ মূলত সিরাজ চরিত্র।৩

নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হিসেবেই এদেশের আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে অধিক পরিচিত। সিরাজ একজন বীর যোদ্ধা। আলীবর্দী খাঁর আমলে বিভিন্ন যুদ্ধে সিরাজ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সিরাজ সাহসী ও নির্ভীক চরিত্রের অধিকারী। প্রাণের ভয়ে তিনি কখনোই ভীত হননি। তারপরও ভাগ্য তাঁকে বিড়ম্বিত করেছে। চারদিক থেকে পরাজয় যেন তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে। এ নাটকের নায়ক ধীরোদাত্ত গুণান্বিত। তিনি বয়সে নবীণ এবং শৌর্যে ক্ষিপ্র। ট্রাজেডীর চরিত্র হিসেবে তারুণ্যের উদ্দামতাই তাঁর পতনের অন্যতম কারণ। পরিণামদর্শী প্রবীণের মতো নন তিনি। সেজন্য বিরোধ এসেছে চারদিক থেকে — ব্যক্তি, পরিবেশ এবং আপন সত্তার নিকট থেকে। অবশেষে ভাগ্য তাঁকে বিড়ম্বিত করেছে। যুদ্ধ প্রান্তরে যদিও সেনাপতিরা যুদ্ধ করেনি, কিন্তু তাঁর পক্ষের তিনজন বিশ্বস্ত সেনাপতি প্রাণপণ যুদ্ধ করে অকালে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন। অসময়ে বৃষ্টি এসে তাঁর বারুদের স্তূপ ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। ভাগ্যাহত সিরাজের প্রদীপ এক এক করে নির্বাপিত হয়েছে। সর্বশেষে মৃত্যু এসেছে এমন এক ঘাতকের হাতে যে তাঁর পিতৃপুরুষের স্নেহধন্য ছিল। সিরাজের জীবননাট্য বড়ই করুণ ও বেদনাদায়ক।

সিকান্দার আবু জাফর এ নাটকে যতখানি ইতিহাস-সচেতন ততখানি নাট্য-সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদের প্রতি তিনি সর্বদাই খুব তীক্ষ্ণ। কিন্তু ব্যক্তি-সিরাজের হৃদয়ের নিভৃত আলোড়ন, তাঁর অসহায় ক্ষোভ ও

Dhaka University Institutional Repository

দংশনের যন্ত্রণা এবং বিড়ম্বিত ভাগ্যের তাড়নায় তাড়িত এক যুবকের অসহনীয় বেদনার সংবাদ নাটকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

এ নাটকে সিরাজ মহৎ, সৎ ও ধর্মভীরু। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সিরাজের মতো তিনি ভীরু কাপুরুষ নন, শচীন সেনগুপ্তের সিরাজের মতো এ সিরাজ ইন্দ্রিয়পরায়ণ নন। বড় বিশুদ্ধ, বড় সাহসী এই সিরাজ।[৪] সিরাজের চরিত্রে সারল্য ছিলো, সর্বোপরি ছিলো দেশ-মাতৃকার জন্য প্রেম। তিনি মীরজাফরকে একবার সন্দেহ করে আবার তাকে বিশ্বাস করেছেন। তাই সিরাজের মুখে শুনতে পাই —

> আমি অন্তহীন সন্দেহ বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বহ হোক আমি একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।[৫]

সিরাজ-উ-দ্দৌলা ছিলেন একজন প্রেমিক পুরুষ। স্ত্রী লুৎফার প্রতি তার অনুরাগ নিখাদ। শত বাধা এবং রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার মধ্যেও তিনি তাঁর স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভে উৎসাহী ছিলেন। সিরাজের সংলাপ এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় —

> আমার চারপাশে লুৎফা। আমার অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যে দেয়ালের ভিড়। উজীর, অমাত্য, সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, দেশের নিশ্চিন্ত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, খালাম্মা আর আমার মাঝখানে, আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে, আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল।[৬]

সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র ঘসেটি বেগম। আলীবর্দী খানের জ্যেষ্ঠা কন্যা তিনি। উচ্চাভিলাষী এই মহিলা ছিলেন অপুত্রক ; আলীবর্দী খানের মসনদের উপর তার ছিল প্রচণ্ড লোভ। তার ইচ্ছা ছিল মধ্যমা বোনের (শাহ বেগম) পুত্র শওকত জঙ্গকে নবাব করা। শওকত জঙ্গ ছিল বিলাসী, মদ্যপ, অযোগ্য। তাই সে যদি নবাব হয় তাহলে নেপথ্য থেকে ঘসেটি বেগম রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবেন — এই উচ্চাভিলাষ তাকে স্বাধীনচেতা সিরাজের বিরুদ্ধে কাজ করতে ইন্ধন যুগিয়েছে।

আলীবর্দী খানের তিন কন্যার মধ্যে ঘসেটি বেগমই বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তার বুদ্ধি ছিল প্রখর। এই জন্য তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তাই সিরাজ কর্তৃক বন্দী হয়েও তিনি ভীত হননি। তবে তার ক্ষোভ তিনি এভাবে প্রকাশ করেছেন —

> কে পুত্র, কে পুত্রবধূ ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব — আমি তার

Dhaka University Institutional Repository

> প্রজা। ক্ষমতার অহঙ্কারে উন্মত্ত না হলে আমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে সে সাহস করত না। মতিঝিল থেকে আমাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারতো না।[৭]

ঘসেটি বেগম বাস করতেন মুর্শিদাবাদে সুরম্য মতিঝিল প্রাসাদে। নওয়াজেস মোহাম্মদের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের সহায়তায় ঘসেটি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে সিরাজ এই ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে মতিঝিল প্রাসাদ থেকে ঘসেটি বেগমকে উৎখাত করে রাজপ্রাসাদে এক প্রকার বন্দী করে রাখেন এবং তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। পলাশী যুদ্ধের পরে ইংরেজরা ঘসেটি বেগমকে ঢাকায় অন্তরীণ রাখে। অবশেষে মীর জাফরের পুত্র মীরনের চক্রান্তে ঘসেটিকে মাঝ নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়।[৮]

সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকে মীর জাফরের চরিত্রটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মীর জাফর আলী খান ছিলেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার প্রধান সেনাপতি। তিনি ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানের ভগ্নিপতি। আলীবর্দী খানের আমল থেকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। বাংলার মসনদের প্রতি তার মোহ তিনি নিজেও গোপন করেননি। তাই তিনি বলেন —

> আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ। ও কথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবী মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ — নবাব আলীবর্দীর আমলে, উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই ভেবেছি, একটা দিন মাত্র, একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।[৯]

১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধে যে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা আজ কিংবদন্তী তুল্য। 'মীর জাফর' শব্দটি এখন বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশব্দ। ইংরেজের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হয়ে মীর জাফর পলাশীর যুদ্ধে সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও কোন যুদ্ধ পরিচালনা করেননি বরং যুদ্ধরত দেশপ্রেমিক সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও তিনি পবিত্র কোরআন শরীফ স্পর্শ করে শপথ করেছিলেন — সর্বদা নবাবের পক্ষে থাকবেন।

ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত এবং চিরকালের বিশ্বাসঘাতক বলে বিবেচিত মীর জাফর ১৭৫৭ সালের ২৯ জুন বিকেল বেলা কর্নেল ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে বসেন। ১৭৬০ সালে তাকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজরা তার জামাতা মীর কাসিমকে বাংলার মসনদ উপহার দেয়। ১৭৬৪ সালে ইংরেজরা পুনরায় মীর জাফরকে সিংহাসন দান করে। বাংলার স্বাধীনতা সংহারকারী এই সর্বজনঘৃণ্য মানুষটি দুরারোগ্য কুষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে সকলের কাছে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য হয়ে ১৭৬৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মারা যায়।[১০]

উপর্যুক্ত চরিত্রগুলো ছাড়াও এই নাটকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আছে, যেমন — ক্লাইভ, জগৎ শেঠ, মানিক চাঁদ, মীরন, মীর মর্দান, মোহনলাল, মোহাম্মদী বেগ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, হলওয়েল, লুৎফুন্নেসা, আমিনা বেগম প্রমুখ।

ক্লাইভ ছিলেন বাবা-মার অবাধ্য সন্তান। তাই তার বাবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরি দিয়ে তাকে ভারতে পাঠিয়ে দেন। ক্লাইভ ছিল ধূর্ত, সাহসী, কৌশলী ও মিথ্যাবাদী। তাই সে চারদিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে বারবার বিভ্রান্ত করেছে এবং সবশেষে রাজ-অমাত্যদের সহযোগিতায় নবাবের পতন ঘটিয়ে বাংলার স্বাধীনতা হস্তগত করেছে। তার চতুরতার পরিচয় নাটকের সব জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন —

> Oh, what nonsense. আমি জানতাম Coward-দের ওপর কোন কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াটস্‌কে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। (মীর জাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কি করব? আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোন ভয় নেই। You are sacrificing the Nabab and not the country. দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।[১১]

মোহনলাল ছিলেন সিরাজ-উ-দ্দৌলার অন্যতম সেনাপতি। কাশ্মীরের অধিবাসী মোহনলাল ছিলেন সিরাজের খুব প্রিয়। পলাশীর যুদ্ধে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে নবাবের জন্য তিনি লড়েছেন। অবশেষে যুদ্ধবন্দী হয়ে ইংরেজদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, নবাবের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতির দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে বাঁচাতে চেয়েছেন মোহনলাল —

> পলাশীতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে জাঁহাপনা। এখন আত্মাভিমানের সময় নেই। আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে।[১২]

বস্তুত শাসনভার গ্রহণের পূর্বেই সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগম, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ প্রমুখের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। সিরাজ-উ-দ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণের পর সে ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়। সিকান্দার আবু জাফর মূলত নবাবের ১৪ মাস শাসনামলের চিত্রই নাটকে চিত্রিত করেছেন।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

সিকান্দার আবু জাফরের *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*-য় ঐতিহাসিক নিষ্ঠা অধিক। আলেয়ার প্রেমে মগ্ন সিরাজ এখানে অনুপস্থিত। সিরাজের জীবনের প্রকৃত সংগ্রামটুকুই যেন নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্যকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ঐতিহাসিক নাটক হলো নাটক, ইতিহাস নয় — এ কথা সত্য। এ নাটকে অনৈতিহাসিক কাল্পনিক চরিত্রের সংখ্যা কম এবং তাদের গুরুত্ব আরও কম।[১৪]

এ নাটকে মীর মর্দান নামটি আসলে চির পরিচিত মীর মদন। পলাশীতে বাংলার স্বাধীনতা বিনষ্টের জন্য সিরাজের চেয়ে কতিপয় বাঙালিই বেশী দায়ী : কায়েমী স্বার্থ, হীন ষড়যন্ত্র ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সে সর্বনাশের মূল — ইতিহাসের এ শিক্ষাই নাট্যকারের জীবনবোধ। এ নাটকে কাহিনী সংগ্রন্থন সুসমন্বিত। দৃশ্যাবলী সুসংলগ্ন, চরিত্রগুলো স্পষ্ট ও ইতিহাসনিষ্ঠ, সংলাপ বাস্তব, সরল ও বিষয়ানুগ, যা আলোচ্য নাটকের উল্লেখযোগ্য আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য।[১৫]

সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে নাট্যকারের নিজের মত এখানে প্রণিধানযোগ্য —

> নতুন মূল্যবোধের তাগিদে, ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে ঐতিহ্য ও প্রেরণার উৎস হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে প্রকৃত ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজ-উ-দ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম ও নৈতিক আদর্শে সিরাজ-উ-দ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদ্‌গুণগুলোকে চাপা দেবার জন্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারীরা ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধানত সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলোকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।[১৬]

সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের ভাষা সহজ ও সাবলীল। এর কোথাও আবেগের বাহুল্য নেই। মাঝে মাঝে হাস্য পরিহাসের জন্য কিছু লঘু দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, অথচ তা নাটকের মানকে ক্ষুণ্ন করেনি। সবদিক বিচারে সিকান্দার আবু জাফরের *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে একটি অনন্য সৃষ্টি।

তথ্যনির্দেশ

১. সিকান্দার আবু জাফর, *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*, (ঢাকা : বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ১৯৯১ সংস্করণ), পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

২. ঐ, পৃ. ২২
৩. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা,* (রাজশাহী : নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭০), পৃ. ৫৩৮
৪. *সিরাজ-উ-দ্দৌলা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
৫. ঐ, পৃ. ৮০
৬. ঐ, পৃ. ১০১
৭. ঐ, পৃ. ৯৭
৮. ঐ, পৃ. ৩৫
৯. ঐ, পৃ. ৮৭
১০. ঐ, পৃ. ৩৮-৩৯
১১. ঐ, পৃ. ৯৪
১২. ঐ, পৃ. ১১১
১৩. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৩০৫
১৪. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা,* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২), পৃ. ৪৭৬
১৫. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৯
১৬. *সিরাজ-উ-দ্দৌলা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মুনীর চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মুনীর চৌধুরী

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করলেও নাট্য-সাহিত্যেই তাঁর পদচারণা সবচেয়ে বেশী সাফল্যলাভ করেছে। মুনীর চৌধুরীর আধুনিক জীবনবোধ ও নাগরিকচেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নাট্য-সাহিত্যে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্য-সাহিত্যে যে নবতরঙ্গের সৃষ্টি হয় স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কালেই তার সূত্রপাত ঘটে মুনীর চৌধুরীর নাট্য-সাধনায়। এক্ষেত্রে তাঁর *কবর* (১৯৫৩), *রক্তাক্ত প্রান্তর* (১৯৬২) এবং একগুচ্ছ একাঙ্কিকার নামোল্লেখ করা যায়। বস্তুত, বাংলাদেশের আধুনিক নাটকের তিনিই পথিকৃৎ শিল্পী।

রক্তাক্ত প্রান্তর মুনীর চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক। তিন অঙ্কে বিভক্ত এই ঐতিহাসিক নাটকটি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) ছায়া অবলম্বনে রচিত। ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করলেও তিনি কায়কোবাদের *মহাশ্মশান* কাব্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।[১] ইতিহাসের ঘটনাবিবৃতি মুনীর চৌধুরীর উদ্দেশ্য ছিল না। বর্ণিত যুগের জীবনযাত্রাকে প্রকটিত করার কোন প্রয়াসও তিনি পাননি। বরং নাটকের প্রধান চরিত্রসমূহের মধ্যে আধুনিক জীবন-চেতনা আরোপ করে তিনি যে নাট্য-সংকট সৃষ্টি করেছেন, তাতে যেমন সে-সব চরিত্র পূর্ণতা পেয়েছে তেমনি বর্তমান কালের দ্বন্দ্বও প্রকাশিত হয়েছে। দূর ইতিহাসের পটে পাত্রপাত্রীদের আবদ্ধ না রেখে তিনি তাদেরকে করে তুলেছেন একালের সামাজিকদের সগোত্র।[২]

মারাঠা শক্তি ও মুসলিম শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে সংঘটিত হয়েছিল পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। দুই পক্ষ যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তারই ভিত্তিতে নাট্য-কাহিনী নির্মিত হয়েছে। মারাঠা বাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন বালাজী রাও পেশোয়া ; আর মুসলিম পক্ষে আহমদ শাহ আবদালী। ইব্রাহিম কার্দি ফরাসিদের নিকট রণবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতিদের অধীনে চাকরি না পেয়ে পেশোয়ার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং নিজ যোগ্যতায় সেনাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে যুদ্ধের সময় তিনি মারাঠাপক্ষ থেকে সরে দাঁড়াতে পারেননি। মুসলিম শক্তি ও মারাঠা শক্তির যুদ্ধের সময় মারাঠা পক্ষের সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও ইব্রাহিম কার্দি মনে-প্রাণে মুসলিম শক্তির জয় কামনা করেছেন।

মুসলিম পক্ষে আছেন অযোধ্যার অধিপতি সুজাউদ্দৌলা, রোহিলার নবাব নজীবউদ্দৌলা এবং কাবুলেশ্বর আহমদ শাহ দুররানী। ইব্রাহিম কার্দির স্ত্রী জোহরা বেগম মুন্নু বেগ ছদ্মনামে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। নজীবউদ্দৌলা জোহরার বীরত্বে বিমুগ্ধ বলে জরিনা ঈর্ষান্বিত। জোহরা স্বামীর (ইব্রাহিম কার্দি) বিপক্ষচারণ করলেও স্বামীপ্রেমে তিনি নিষ্ঠাবান।

মুসলিম ও মারাঠা শক্তির মধ্যে যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে প্রচুর রক্তপাত ও ক্ষয়-ক্ষতির পর অবশেষে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। হিরণবালা, দিলীপ, বিশ্বাস রাও নিহত হয়। ইব্রাহিম কার্দি মুসলিম বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে কারাগারে আনীত হন। যুদ্ধে জোহরা বেগম যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তার পুরস্কার স্বরূপ আহমদ শাহ আবদালীর কাছে স্বামীকে মুক্ত করার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তা মঞ্জুরও হয়। কিন্তু মুক্তির ফরমান নিয়ে জোহরা বেগম যখন কারাগারে উপস্থিত হন, তার পূর্বেই ইব্রাহিম কার্দি মৃত্যুবরণ করেন। নজীবউদ্দৌলা, আতা খাঁ প্রমুখ মিলে ইব্রাহিম কার্দির লাশ কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে যায়। এভাবেই নাটকের যবনিকাপাত হয়।

আলোচ্য নাটকটি ঐতিহাসিক নাটক হলেও এর মধ্যে নাট্যকার আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংক্ষোভ সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ-প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর অভিমত উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন —

> কাহিনীর সারাংশ আমি কায়কোবাদের *মহাশ্মশান* কাব্য থেকে সংগ্রহ করি। তবে নাটকে স্বাধীন ও অন্তরের আচরণ এবং উক্তির বিশিষ্ট রূপায়ণে আমি অন্যের নিকট ঋণী নই। আমার নাটকের চরিত্র চিত্রণ, ঘটনা সংস্থাপন ও সংলাপ নির্মাণের কৌশল আমার নিজস্ব। যে জীবনোপলব্ধিকে যে প্রক্রিয়ায় *রক্তাক্ত প্রান্তরে* উজ্জ্বলতা দান করা হয়েছে তার রূপ ও প্রকৃতিও সর্বাংশে আধুনিক।[৩]

যুদ্ধ কল্যাণ নয়, ধ্বংসই ডেকে আনে। নাটকে একটি যুদ্ধবিরোধী চেতনা বর্তমান। এই চেতনা আধুনিকতাজাত। মুনীর চৌধুরীর ভাষায় —

> .... একটা তত্ত্বগত দৃষ্টিও এই নাটকে প্রশ্রয় লাভ করেছে। সে হল এ যুগের অন্যতম যুদ্ধ-বিরোধী চেতনা। .... একালের আরও অনেক নাট্যকারের মতই সংগ্রাম নয় শান্তির বাণী প্রচারে যত্ন নিয়েছি।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকে নায়িকার প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। এখানে জোহরা বেগমের হৃদয়-যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ট্রাজিক মহিমায় রূপলাভ করেছে। জোহরা বেগমের দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয় — একদিকে তিনি রূপবতী ও প্রেমময়ী রমণী, অন্যদিকে বীরাঙ্গনা ও জাতীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত সেবিকা। রমণীয় অনুভূতি দ্বারা তাড়িত হয়ে যেমন তিনি স্বামীর কাছে ছুটে যান, তাকে নিজের করে পাওয়ার জন্য আকুল হন ; অন্যদিকে তিনি নিজ দেশ ও জাতির স্বার্থে বীরাঙ্গনা মূর্তি ধারণ করেন। এই যে দুটি সত্তা এটি একজন আধুনিক মানুষের পরিচয় বহন করে। মুনীর চৌধুরী নিজে একজন আধুনিক মানুষ, তাই তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যেও এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

কুঞ্জরপুর দুর্গে এসে জোহরা বেগম ইব্রাহিম কার্দিকে মারাঠা পক্ষ ত্যাগ করে মুসলিম পক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ইব্রাহিম কার্দি তাতে সম্মত হন না এবং আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেন —

> ... তুমি আমার কাছ থেকে চলে যেও না জোহরা! জোহরা, আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো। যখন অন্ধকারে শ্বাসরোধ হয়ে আসবে তখন যেন অনুভব করতে পারি তোমার মেহেদী পরা হাত রক্তহীন দেহ আঁকড়ে ধরে রেখেছে।[৫]

কার্দির এই আহ্বানে ক্ষণিকের পুরুষবেশী জোহরার হৃদয়ও থরথর আবেগে কম্পিত হয়েছিল কিন্তু স্বামীকে সে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই জোহরার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় — 'আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। এই মারাঠা শিবিরে তোমাকে আমি স্পর্শ করতে পারবো না। আমি মেহ্‌দী বেগের কন্যা। মারাঠা দস্যুরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে। এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে। আমি তোমার কাছে এগুবো কি করে ? তোমার হাতে হাত রাখবো কি করে ? আমাকে ক্ষমা করো।'[৬]

এই নাটকে ইব্রাহিম কার্দির অন্তর্দ্বন্দ্বও সার্থকভাবে রূপ লাভ করেছে। মারাঠা বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তিনি তার প্রেমানুভূতির কাছে পরাজিত হয়ে বিবেকের কাছে অপরাধী হতে পারেননি। ইব্রাহিম কার্দি মনে করেছেন মারাঠা বাহিনী তাকে একদিন জীবিকার সংস্থান যুগিয়েছে। তাই মুসলমান হয়েও মারাঠাদের বিপক্ষচারণ করা তার কাছে বিবেক বহির্ভূত কাজ বলে মনে হয়েছে। সে মনে-প্রাণে চেয়েছে মুসলিম শক্তির জয় হোক। ইব্রাহিম কার্দির উচ্চারণেই পাই তার অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষার কথা —

> যে ফিরে যাবে সে আমি হবো না। সে হবে বিশ্বাসঘাতক। সে হবে ইব্রাহিম কার্দির লাশ। তাকে দিয়ে তুমি কি করবে? তুমি কাঁদছো! ভারতে মুসলিম শক্তি জয়যুক্ত হোক, তার পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

> গৌরব সে ফিরে পাক — বিশ্বাস করো এ কামনা আমার মনে অহরহ জ্বলছে। কিন্তু ভাগ্য আমাকে প্রতারিত করেছে। সে গৌরবে অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। আমার সঙ্কটের দিনে যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, কর্মে নিযুক্ত করেছে, ঐশ্বর্য দান করেছে সে মারাঠাদের বিপদের দিনে আমি চুপ করে বসে থাকবো ? পদত্যাগ করবো? দলত্যাগ করবো? সে হয় না জোহরা। আমি নিশ্চিত জানি, জয়-পরাজয় যাই আসুক, মৃত্যু ভিন্ন আমার মুক্তির অন্য কোন পথ নেই।[৭]

আলোচ্য নাটকে ইব্রাহিম কার্দি একজন বীরযোদ্ধা। সর্বোপরি একজন আদর্শ মানুষ। তার আবেগ, ভালোবাসা, হৃদয়ানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশে নাট্যকার বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ইব্রাহিম কার্দি যেন প্রতিকূল নিয়তির নির্দেশে চালিত। এই প্রতিকূল নিয়তিই পরিণামে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

নবাব নজীবউদ্দৌলা নাটকের একটি উজ্জ্বল চরিত্র। তিনি জোহরা বেগমের বীরত্বে ও রূপে বিমুগ্ধ। আদর্শবাদী এই পুরুষ জোহরা বেগমের প্রতি যে আসক্ত, তা তিনি কখনই প্রকাশ করতেন না, যদি না তাঁর স্ত্রী জরিনা বেগম তাকে কটাক্ষ করতো। জরিনা বেগমের কটাক্ষের কারণেই জোহরা বেগমের প্রতি আপন মনোভাব নজীবউদ্দৌলা প্রকাশ করেছেন এভাবে —

> কোন্‌টা বেশী সত্য? গত দেড়মাস ধরে নিশাচর পাখীর মত তোমার মনের চারধারে ডানা ঝটপট করে উড়ে মরেছি। এক মুহূর্তের জন্যও একটা নিশ্চিন্ত বিশ্বাস নিয়ে স্থির হতে পারিনি। শত্রু সৈন্যকে আঘাত করবার জন্য যখন উদ্যত অসি হাতে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছো তখন কতোবার তোমার পৌরুষ, তোমার কাঠিন্য, তোমার হিংস্রতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু তারপরই চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি তুমি ভেতরে ভেতরে কত শ্রান্ত, কতো অসহায়, কত অশান্ত।[৮]

আলোচ্য নাটকে দার্শনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সুজাউদ্দৌলা। তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানবতাবাদী মানুষ। চারপাশের মানুষের জীবন ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনি সচেতন। তিনি যে তার কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ তার প্রকাশ তিনি দেখিয়েছেন যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।

এই নাটকে বশির খাঁ, আতা খাঁ, দিলীপ, রহিম শেখ — এসব সাধারণ চরিত্র। নাটকের জরুরী প্রয়োজনেই এদের আগমন। তবে এদের উপস্থিতি দর্শকমনে অনেক হাস্য কৌতুকের জন্ম দিয়েছে।

রক্তাক্ত প্রান্তরে কোনো আদর্শ প্রচার নেই, নেই কোনও হিতোপদেশ অথবা বাণী প্রচারের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম। ইতিহাস ও তার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এখানে পটভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র। নায়ক ইব্রাহিম কার্দি ও নায়িকা জোহরা বেগম রক্ত-মাংসে গড়া দুই নর-নারী। এরা ইতিহাসের মানুষ হলেও আমাদের পরমাত্মীয়ের হৃদয় স্পন্দন এদের ভেতরে অনুভব করতে পারি।[৯]

রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের ভাষা অত্যন্ত সাবলীল। সংক্ষিপ্ত নিরলংকৃত বাক্য এবং দীর্ঘ অলংকৃত বাক্য — দুইয়েরই প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তবে, আলোচ্য নাটকের ভাষা বিশেষভাবে অলংকৃত। বিষম ও বক্রোক্তি এবং স্তূপীকৃত বিশেষ্য ও বিশেষণ সেই অলংকৃত ভাষার বিশেষ লক্ষণ। নাটকের উচ্ছ্বসিত ও আবেগময় সংলাপ আমাদের প্রতিদিনকার ভাষায় গঠিত নয়, একথা সত্য। তবে তা কৃত্রিম শুধু এই অর্থে — যে অর্থে নাটকের ভাষা মাত্রই কৃত্রিম।[১০]

ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হলেও *রক্তাক্ত প্রান্তর* নাটকে ইতিহাসকে ছাপিয়ে আধুনিক জীবনচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটির সংলাপ বলিষ্ঠ, স্পষ্ট ও বাস্তবধর্মী। মানব চরিত্রের প্রেম, বীরত্ব, ঔদার্য ইত্যাদি অনুভূতি ও বিচিত্র রহস্যের প্রতি নাট্যকার তীর্যক আলোক নিক্ষেপ করেছেন। তিনি ইতিহাসের পটভূমিতে আধুনিক জীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন, আবেগহীনভাবে সর্বজনীন চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে।[১১]

রক্তাক্ত প্রান্তর প্রচারধর্মী নাটক নয়। এখানে অতীতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাট্যকার বর্তমান প্রেক্ষাপটের অবতারণা করেছেন। 'যুদ্ধ নয় শান্তি' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আলোচ্য নাটক রচনার প্রেরণা হিসেবে নাট্যকার তার বক্তব্য এভাবে প্রকাশ করেছেন —

> যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রেমের নাটক রচনা করতে গিয়ে আমিও হয়তো, একালের আরও অনেক নাট্যকারের মতোই, সংগ্রাম নয় শান্তির বাণী প্রচারে যত্ন নিয়েছি। এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আমি নাটকের বশ, ইতিহাসের দাস নই। নাটকে ইতিহাস উপলক্ষ্য মাত্র। তাকে আমি নির্বাচন করি এই জন্য যে তার মধ্যে আমার আধুনিক জীবন-চেতনার কোনো রূপক আভাসে হলেও কল্পনীয় বিবেচনা করেছি।[১২]

রক্তাক্ত প্রান্তর নাটক প্রকৃত অর্থেই বাংলা নাটকের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ইতিহাসকে মুনীর চৌধুরী বর্তমানের মানবভাগ্যের মুকুর হিসেবে দেখেছেন এবং ইতিহাসের অস্থি-করোটিতে সঞ্চারিত করেছেন আধুনিক জীবনবেদ। ইতিহাসের দাসত্ব স্বীকার না করে বরং শিল্পের প্রতি সমর্পিত হওয়ার কারণেই *রক্তাক্ত প্রান্তর* নাটকে মুনীর চৌধুরী অর্জন করেছেন কালোত্তীর্ণ সাফল্য।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, (রাজশাহী : নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭০), পৃ. ৪৬৫

Dhaka University Institutional Repository

২. *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী* (১ম খণ্ড), সম্পাদক : আনিসুজ্জামান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), দ্র. ভূমিকা, পৃ. ১০
৩. মুনীর চৌধুরী, *রক্তাক্ত প্রান্তর,* ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, পৃ. ভূমিকাংশ।
৪. ঐ, পৃ. ভূমিকাংশ।
৫. ঐ, পৃ. ১৯
৬. পূর্বোক্ত।
৭. ঐ, পৃ. ১৮-১৯
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
৯. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২), পৃ. ৪৪৮
১০. *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী* - প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
১১. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮১
১২. *রক্তাক্ত প্রান্তর,* পূর্বোক্ত, দ্র. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আসকার ইবনে শাইখ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আসকার ইবনে শাইখ

আসকার ইবনে শাইখের (জ. ১৯২৫) প্রকৃত নাম এম. ওবায়েদুল্লাহ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন নির্বাহ করেন। বাংলাদেশের নাট্যজগতে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যপরিচালক এবং মঞ্চ-নির্দেশক প্রভৃতি পরিচয়ে তিনি বিশিষ্ট। নাট্য-সমালোচক হিসেবেও তাঁর অবদান প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশের সমাজজীবন নিয়ে নাটক রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সামাজিক নাটক রচনায় তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেও তিনি রেখেছেন তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর। আসকার ইবনে শাইখের ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যা তিন — *রক্তপদ্ম* (১৯৫৭), *অগ্নিগিরি* (১৯৫৯) এবং *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৬৫)।

রক্তপদ্ম

রক্তপদ্ম (১৯৫৭) আসকার ইবনে শাইখের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকে কোন অঙ্ক বিভাজন নেই। আটটি দৃশ্যের সমবায়ে রচিত হয়েছে *রক্তপদ্ম*। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটক।

রক্তপদ্ম দেশপ্রেমের সুতীব্র অনুভূতি-রসে সিক্ত। আঠার শ' সাতান্ন সালে সাম্রাজ্যবাদী শোষক-বেনিয়াকে এদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে দেশকে আজাদ করবার যে পবিত্র দায়িত্ব এবং মরণপণ শপথ সেদিনের মানুষ গ্রহণ করেছিলেন এবং অসংখ্য জীবন নিঃস্বার্থভাবে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, তারই শিল্প-চেতন আলেখ্য এ নাটক। ইতিহাসের পটভূমিতে জাতীয় চেতনা, কর্তব্য, শুভবুদ্ধি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার উজ্জীবনই এ নাটকের মূল বক্তব্য। ইতিহাসের দূর দিগন্তের বিয়োগ-ব্যথায় অশ্রু

Dhaka University Institutional Repository

বিসর্জনের কোন আয়োজন শিল্পীর ভাবনার বিষয় নয়, বরং ইতিহাসের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানকে গড়ে তোলার আহ্বান জানানোই তাঁর দায়িত্ব — এমন ঔদার্য চিন্তা এ নাটকে শিল্পরূপ লাভ করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর পুরোনো দিনের দুর্বল আর কলংকিত অধ্যায়কে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলবার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে *রক্তপদ্ম* নাটকে। আলোচ্য নাটকের মূল ঘটনাংশ নিম্নরূপ —

কানপুরের মানুষের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সিপাহিরাও তার প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত। বিপ্লবীরা ব্লেনম্যানকে বন্দী করেছে। ফলে বিবার্ট ও হুইলার খুব ক্ষিপ্ত হয়েছে। তারা আজিজনকে আকবরের পাহারায় রাখলেও তাকে আর বিশ্বাস করতে পারলো না। আজিমুল্লাহ শামসুদ্দীন ও রাকীবের আলোচনা শেষ না হতেই কোম্পানীর 'গোরা সৈন্য' সিপাহীদের আক্রমণ করে অতর্কিতে।[১]

শেরখান ছত্রভঙ্গ সিপাহীদের উৎসাহ দিয়ে জাগাতে চেষ্টা করেন, পরে সে ব্যর্থ হয়। আজিজন এই ছত্রভঙ্গ সিপাহীদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন এবং সফল হন। তাঁর ডাকে পলায়নরত সিপাহীরা এগিয়ে যায়। আজিজন নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অবশেষে শহীদ হন। কিন্তু তাঁর আহ্বানে সিপাহীরা যুদ্ধে এগিয়ে যায় এবং জয়লাভ করেন। সংক্ষিপ্ত এই কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে *রক্তপদ্ম* নাটক।

রক্তপদ্ম নাটকের মৌল বিষয় এবং চরিত্রায়ণ-কৌশল আলোচনা করতে গেলে সংক্ষেপে সিপাহী বিদ্রোহের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন।

পাক ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ একটি জটিল সমস্যা রূপে পরিগণিত। এই অভ্যুত্থানের স্বরূপ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতান্তরের শেষ নেই। কেউ কেউ একে ধর্মান্ধ সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসেবে দেখেছেন, কেউ বা একে মনে করেছেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হিসেবে। অভ্যুত্থানটির মধ্যে এই সমুদয় লক্ষণই সমীকৃত হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

এই বিদ্রোহের প্রথম উপলক্ষ হিসেবে ধরা হয় নতুন ধরনের কার্তুজের ব্যবহার। এটি দাঁত দিয়ে কাটতে হত। ধারণা করা হয় এর মধ্যে শূকর আর গরুর চর্বি মেশানো ছিল। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

আত্মশক্তিতে অত্যুগ্র বিশ্বাস সিপাহীদের বিদ্রোহ ঘোষণায় প্ররোচনা দেয়। তাঁরা জানতেন যে বার্মা থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভারত তাদেরই বাহুবলে কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়েছে। সিপাহীদের সাহায্য ছাড়া কোম্পানীর রাজত্ব ছায়ার মত মিলিয়ে যাবে। তাই তাদের দাবী দাওয়া মেনে নিতে কোম্পানী বাধ্য। সৈন্য বাহিনীর বিদ্রোহের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী আমলে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তরা এবং সত্যিকার স্বাধীনতাকামীরাও এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন এবং তখনই তা ব্যাপক গণবিদ্রোহে পরিণত হলো।

এই অভ্যুত্থান পূর্ব পরিকল্পিত কিনা — এটি গুরুতর প্রশ্ন। স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে — এ বিদ্রোহ একান্তই আকস্মিক, কোন ধীরস্থির পরিকল্পনার ফল নয়।

বাংলার শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই অভ্যুত্থানের প্রতি নানাভাবে বিমুখতা প্রকাশ করলেও, স্মরণ রাখা দরকার যে এর সূচনা হয় বাংলাদেশেরই বারাকপুর ও বহরমপুরে। এই দুই জায়গায় বিদ্রোহ দমন করতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। সেখানকার সৈন্যরা কারাগার ভেঙে বন্দীদের মুক্তি দিলেন, ইউরোপীয়দের লাঞ্ছিত করলেন এবং তাঁদের একদল দিল্লী এসে আভূমি প্রণতি জানালেন মুঘল বংশের ক্ষমতাহীন সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে। বিদ্রোহীদের দখলে দিল্লী চলে এলে দিল্লীই হল বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। তারপর এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল রোহিলাখণ্ড, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, ঝাঁসী এবং পাটনায়। বাংলাদেশে এর প্রতিধ্বনি জাগল ঢাকা ও চট্টগ্রামে।

কোম্পানীর রাজ্যগ্রাসনীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তবাদীরা যে বিদ্রোহের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। বাহাদুর শাহ, ওয়াজিদ আলী শাহ, রাণী লক্ষ্মীবাই, নানাসাহেব — এসব নেতার প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল এই বিদ্রোহের সঙ্গে। এ বিদ্রোহ যে সামন্ততন্ত্রের পুনরুত্থান নয় তার একটি প্রমাণ বাহাদুর শাহ্‌র আচরণেই পাওয়া যায়। সিপাহীরা যদিও তাকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু আগেকার মুঘল সম্রাটদের মতো তিনি সিপাহীদের আজ্ঞাকারী হতে পারেননি। পুরোনো ভূমি-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাষীর হাতে জমি দিতে প্রতিশ্রুত হন বিদ্রোহের নায়কেরা। আর অন্যায় করভার থেকে প্রজাদের মুক্তিদানেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তবু এই বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তার কারণ সিপাহীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং কোম্পানী কর্তৃক এদেশবাসীর বিরুদ্ধে এদেশবাসীকে দাঁড় করাবার কূটকৌশল প্রয়োগ। এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহীদের এই বিদ্রোহই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। আর এই গণ-অভ্যুত্থানের পশ্চাতে হিন্দু নেতাদের পাশাপাশি মুসলমানদের ভূমিকাও যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।[২]

রক্তপদ্ম নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আজিজন। পেশায় সে নর্তকী। আজিজনের বাবা ছোটবেলায় মারা যান। তার মাকে ফিরিঙ্গিরা ধরে নিয়ে যায়। তাদের অত্যাচারের

Dhaka University Institutional Repository

ফলে আজিজনের মার মাথা খারাপ হয়ে যায় এবং পরে সে আত্মহত্যা করে। অসহায় আজিজনকে ইংরেজরা তাদের স্বার্থে গান শেখায় বিনোদন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। আজিজনের কাছে বিদেশী সাহেবরা আসে। নবীন সিপাহীরাও আসে। সুবেদার শামসুদ্দিন ভালোবাসে আজিজনকে। কিন্তু আজিজনের আছে সামাজিক বাধা। এই বাধা অতিক্রম করে আসা একজন নর্তকীর পক্ষে সম্ভব নয়। আজিজন নর্তকী হলেও সে মানুষ ; তার ভিতরে আছে মানবীয় আবেগ, ভালোবাসা, সর্বোপরি দেশের জন্য মমত্ববোধ। তাই যখন এদেশের নিপীড়িত মানুষ বিদ্রোহ করেছে, বিদ্রোহ করেছে সিপাহীরা, সেই মুহূর্তে স্থির থাকতে পারেনি আজিজন। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি এক ধরনের দায়িত্ব অনুভব করেছে সে। তাই পলায়নরত সিপাহীদের পুনরায় যুদ্ধে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে আজিজন বলে —

> ভাই সিপাহী! তোমরা পুরুষ। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তোমাদের সংগ্রাম করতে হয়। দেশের মান রক্ষা করা, মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্যে সাড়া দেবে বলেই তো তোমরা সিপাহী। আজ বিদেশী দুশমন তোমাদের উপর জুলুম করছে। দেশের বাদশা বাহাদুর শাহ্‌কে অমান্য করছে ওই গোটা কয় বেনিয়া। গোলাম করে রেখেছে সারা দেশকে। ভেবে দেখ, এ অবস্থায় তোমাদের কর্তব্য কি? তোমরা পালিয়ে এসেছ। তোমাদের মা-বোনের উপর চলবে এবার পশুর জুলুম। সে জুলুম থেকে বাঁচতে হলে তোমাদের মা-বোনকেই আজ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।
>
> [আজিজনের কণ্ঠ আরও দৃপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে তার আওয়াজ। সিপাহীরা আস্তে আস্তে এসে জমায়েত হয়।]
>
> তাই যদি তোমরা চাও, চেয়ে দেখ, সামান্যা এ নারীর হাতে এই তলোয়ার কেমন খেলা করে। আর যদি মানুষের মত বেঁচে থাকতে চাও, তবে চল, বেনিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়। আমি তোমাদের সাথে থাকবো। জীবনের আরাম আয়েশ ঝেড়ে ফেলে এক নাচওয়ালী যদি জীবন দিতে পারে, তোমরা পারবে না ভাইসব?
>
> [সিপাহীরা দৃপ্তভঙ্গীতে এগিয়ে চলে]
>
> ভুলো যেয়ো না, তোমাদের ওয়ালেদান একদিন লাখো দুশমনের কাফেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ত![৩]

রক্তপদ্ম নাটকের এক উদ্দাম যুবক শামসুদ্দিন। সে কোম্পানীর অধিনস্ত একজন সুবেদার। অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্বে সে নিয়োজিত। কিন্তু যৌবনসুলভ চপলতার কারণে সে নর্তকী আজিজনের প্রেমে মত্ত। কিন্তু দেশ যখন বেনিয়া কোম্পানীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তখন রমণী-প্রেমে ডুবে থাকা একজন সৈনিকের জন্য শোভন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাই শেরখান তার হাতে তুলে দিয়েছে চাপাতি আর রক্তপদ্ম। এই প্রেরণায় সে বলে ওঠে —

> .... না থাকলেও সবাইকে তা অর্জন করতে হবে। বেনিয়া প্রভুত্বের এই একশ' বছর আমরাই রুখে দাঁড়িয়েছি আমাদের। আমরা আমাদেরই রক্তে রঞ্জিত করেছি দু'হাত। ছলনা আর ভাগ্যের জোরে বেনিয়া কোম্পানী গলায় পরেছে জয়ের মালা।[৪]

শেরখান এই নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বুড়ো এই মানুষটি নিজের সব কিছু হারিয়ে সর্বস্বান্ত। একমাত্র বেঁচে আছে তার ছোট ছেলে। বুড়ো বয়সে সে-ই তাঁর একমাত্র আশার আলো। শেরখান এক এক করে সিপাহীদের জাগ্রত করতে চেষ্টা করে। সে জনে জনে রক্তপদ্ম ও চাপাতি সরবরাহ করে চলেছে। সে এই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। বেনিয়া কোম্পানীর হাত থেকে এই দেশ স্বাধীন করার জন্য দেশের প্রতিটি যুবকের কাছে সে অভয় বাণী তুলে ধরেছে —

> লড়াই! ভয় কিসের? মরদ যখন লড়াই তো করতেই হবে। দরকার হলে মরতেও হবে। আর বাঁচতে চাইলেই কি বাঁচা যায়? মরণ! সে যে বড় নিষ্ঠুর। মরণ যেদিন কাছে আসবে, সেদিন কিছুতেই তাকে ফেরানো যাবে না। সাদা মালিকের কাছে থেকেও, সাত মহলার মাঝে থেকেও টেনে নেবে। আমি কি চাইনি আমার আপন জন বেঁচে থাক ? হাসি থাক ঘর জুড়ে ? সুখ থাক মন ঘিরে ? কিন্তু মরণ যে তা মানল না। ধন তো আগেই গিয়েছিল। তারপর জন গেল, মন গেল, হাসি গেল, সুখ গেল! সব কিছু হয়ে গেল ধূ ধূ এক মরুভূমি![৫]

কিলীচ খান চরিত্রটি কিছুটা ব্যতিক্রমভাবে তৈরী করেছেন নাট্যকার। কিলীচ ইংরেজদের এক মোসাহেব। পূর্বে তার খানদান থাকলেও এখন সে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ। ইংরেজদের গোলামী করে, তাদের কাছে ভালো সেজে সে দু'চার পয়সা উপার্জন করার চেষ্টা করে। সে নিজেকে বাঁচিয়ে কিছু আদায়ের চেষ্টায় সর্বদা তৎপর। তার উচ্চারণেই আছে সে-সত্যের ইঙ্গিত —

> হ্যাঁ ভাই, ঠাণ্ডা হাওয়া খাব বলে এসেছিলাম। কিন্তু মালুম হচ্ছে, হাওয়া বড় গরম। ... এখন বুড়ো হয়েছি। তোমাদের জোয়ানী দেখে দেখেই যতটুকু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে।[৬]

১৮৫৭ সালে কানপুরে বেনিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে এদেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ-বিপ্লবের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীই এ নাটকে পটভূমি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এ-বিদ্রোহ সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিসংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। যদিও এ মুক্তিসংগ্রাম সেদিন সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেনি, তথাপি সে-

Dhaka University Institutional Repository

দিনের সিপাহী-জনতার দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং বীরত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন নাট্যকার।

নাট্যকারের এই স্বদেশ-চেতনার অন্তরালে নর্তকী আজিজন এবং সুবেদার শাসুদ্দিনের প্রেম নাটকে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আজিজন নর্তকী হলেও সে নারী। সুবেদার শামসুদ্দিনকে ভালবেসে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তার সে ঘর বাঁধা হয়নি। অত্যাচারিত শোষিত জনগণ তথা সিপাহীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে সে নেমে এসেছিল জনতার কাতারে। আজিজনের আহ্বানে ছত্রভঙ্গ সিপাহীরা সেদিন একত্রিত হয়েছিল। প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আজিজনকে ইংরেজের গুলিতে প্রাণ দিতে হলো।

ট্রাজিক আবেদন *রক্তপদ্ম* নাটকটিকে কালোত্তীর্ণ মহিমা দান করেছে। এ-নাটক সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য —

> ইতিহাস হাতড়ে লেখক এ কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন। সেদিক দিয়ে এ পরিশ্রমের কৃতিত্ব নাট্যকারের প্রাপ্য। এ নাটক ট্রাজেডি। শামসুদ্দিন-আজিজনের প্রেম এবং আজিজনের আত্মত্যাগ শামসুদ্দিনের হৃদয়ে যে আলোড়ন তুললো তাই 'রক্তপদ্মে'র বিষয়বস্তু বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।
>
> সমস্ত নাটকটিকে একটি তীব্র অনুভূতির স্ফুরণ হিসেবে উপস্থাপিত করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য। তবে চরিত্রের দ্বন্দ্বহীনতার কারণে কোন যন্ত্রণাই দর্শক মনে সঞ্চারিত হয় না।[৭]

— সমালোচকের এ-উক্তি যথার্থ। কাহিনী সুগ্রন্থিত নয়। আজিজন-শামসুদ্দিনকে কেন্দ্র করে নাটক দ্বন্দ্বমুখর হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। তবে সংলাপ আবেগধর্মী ও বলিষ্ঠ।

রক্তপদ্ম নাটকের শৈল্পিক-ত্রুটি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালেচক ড. নীলিমা ইব্রাহিমের অভিমতও এখানে স্মরণযোগ্য — "রক্তপদ্মের কাহিনী ঐতিহাসিক হলেও এর গ্রন্থনা কিছুটা শিথিল এবং আজিজনের চরিত্রটিও একমাত্র তাঁর শেষ মুহূর্ত ছাড়া আমাদের খুব বেশী আকৃষ্ট করতে পারেনি। এ নাটকে চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা আদর্শ প্রচারই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। নাট্যকার সর্বত্র নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করতে সমর্থ হননি।"[৮]

রক্তপদ্ম নাটক বিপ্লবের প্রতীক। এর কাহিনী ঐতিহাসিক না হলেও ইতিহাস-নির্ভর। নর্তকী আজিজন ও সুবেদার শামসুদ্দিনের প্রেম এবং আজিজনের আত্মত্যাগ *রক্তপদ্ম*-এর মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-ঘটনা ঐতিহাসিক এমন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। দেশপ্রেমের এক প্রচণ্ড নেশা কাহিনীকে গতিদান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

রক্তপদ্ম নাটক রস-পরিণতিতে ট্রাজেডি কিন্তু আশানুরূপ বেদনা-বিধুরতা, চারিত্রিক সংঘাত ও উৎকণ্ঠা নাটকটিতে নেই। চরিত্রগুলোতে কোন অসাধারণ মহিমাও নেই, তবে আজিজন নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল। এ নাটকের সংলাপে আবেগ আছে, ব্যঞ্জনা আছে এবং বলিষ্ঠতাও আছে।[৯]

আসকার ইবনে শাইখ *রক্তপদ্ম* নাটকে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকে কেন্দ্র করে আজিজন-শামসুদ্দিনের প্রেমের আড়ালে এদেশবাসীর মুক্তিসংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়কে উপস্থাপন করেছেন। যুগে যুগে এদেশের উপর বহির্শক্তির হামলা হয়েছে, এদেশবাসী অত্যাচারিত, শোষিত হয়েছে — আবার এই দেশেরই সাহসী সন্তানেরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জীবন দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের এই গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের ঐতিহ্য *রক্তপদ্ম* নাটকটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

অগ্নিগিরি

আসকার ইবনে শাইখের *অগ্নিগিরি* প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। ফকীর আন্দোলনের পটভূমিকে কেন্দ্র করে এই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। ১৭৬০ থেকে শুরু করে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সন্ন্যাসী ও ফকীররা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে নিয়মিত শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন। ফকীরদের মধ্যে মাদারিয়াপন্থীদের সংখ্যাই ছিল অধিক। তাঁদের নেতা কানপুরের মজনু শাহের নাম সেকালে ত্রাসের সঞ্চার করত। মজনু ছিলেন বুরহানপন্থী ফকীর। তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল মাসনপুর। তাঁর অনুগামী সন্ন্যাসী ও ফকীরদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তরবঙ্গ, তবে পূর্ববঙ্গেও তাঁদের যাতায়াত ছিল। মজনু শাহ্‌র সঙ্গে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। ফকীর ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে কখনো কখনো সংঘর্ষ লেগেছে বটে, তবে দুর্যোগ মুহূর্তে দেশের স্বার্থে তাঁরা একযোগেও কাজ করেছেন। নেপাল সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ছিল এবং শেষ পর্যন্ত অনেকে নেপালেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহ্‌র মৃত্যু ঘটে।[১০]

অগ্নিগিরি ফকীর আন্দোলনের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে দেশপ্রেমমূলক নাটক। বাংলাদেশ দখলের পর ইংরেজদের ক্ষমতা বিস্তারে নানা রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মজনুর নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ পরিচালিত হয় তার ফলে

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাপটেন টমাস নিহত হয় এবং এই যুদ্ধের পর একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ফকীররা কুচবিহারের দিকে যাত্রা করেন। অতঃপর সারা দেশে এদের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। মজনু শাহ্‌র সঙ্গে ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানীর সম্পর্ক ছিল। এরা একযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী তস্করের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার। সম্প্রতি কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, বাংলার এই ফকীর-বিদ্রোহই স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম। ইংরেজ এবং ইংরেজ-সমর্থক ঐতিহাসিকগণ এদের হামলাকারী বা ডাকাত নামেই অভিহিত করেছে। হেস্টিংস্-এর শাসনকালে তার সমর্থনপুষ্ট দেওয়ান দেবী সিং প্রজাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করতো, বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য এডমন্ড বার্ক, শেরীডা প্রভৃতি নেতাও তা স্বীকার করেছিলেন। সেই অত্যাচারের বিভীষিকা, ইংরেজ কোম্পানীর নির্মমতা ও মজনু শাহ্‌র আন্দোলন-সংগ্রাম এবং প্রজা-বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে *অগ্নিগিরি* নাটক।[১১]

দেবী সিংহের অত্যাচারের পটভূমিকায় জনগণের নেতারূপে নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহম্মদ হুসাইন জঙ্গ বাহাদুর, যাকে সাধারণ মানুষ জানতো মজনু শাহ্ রূপে, তাকেই এ নাটকে আমরা নায়ক বা গণঅভ্যুত্থানের নেতারূপে পাচ্ছি। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কিছু ইতিহাসের চরিত্র এখানে আছে। মজনু শাহ্‌র ভেতর দিয়ে কোথাও কোথাও আমরা নাট্যকারকে খুঁজে পাই। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম আজও শেষ হয়ে যায়নি। যে-সূত্রে ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের আকাঙ্ক্ষার এক সম্পর্কবন্ধন নাট্যকার এখানে নির্মাণ করেছেন।[১২]

জনগণের নেতারূপে স্বীকৃত মজনু শাহ্ এ নাটকের নায়ক। নায়কোচিত গুণাবলী মজনু শাহ্ চরিত্রে বর্তমান। অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণকে প্রতিবাদী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন —

> প্রয়োজনে জালেমকে মেরে মরতে হবে। তোমাদের ইজ্জত, মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে আজ তোমরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। .... এদেশ আমার। এ দেশ তোমার। তোমার আমার পূর্ণ অধিকার হারিয়ে আমরা আজ মরতে বসেছি। মরবার আগে তাই চেষ্টা করে দেখি, দেবীর উদ্ধত শির মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি কিনা।[১৩]

যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার সময় মজনু শাহ্ বুলেট বিদ্ধ হন। মৃত্যুশয্যায়ও তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এই আশ্বাস-বাণী —

> পরাস্ত আমরা কোনদিন হব না। গড় থেকে অন্য গড়ে, গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গড়ে উঠবে আমাদের এমনি প্রতিরোধ ব্যবস্থা। জন্মভূমিকে আমরা বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করব।

Dhaka University Institutional Repository

> এই আমাদের পণ। ... রুদ্ধ আক্রোশ ওদের উপর ছড়িয়ে পড়বে। ওরা এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এ দেশ আবার মুক্ত হবে। সেদিন বেশী দূরে নয়। আজ না হোক, কাল সেই স্বর্ণপ্রভাতে আমার দেশ আবার হেসে উঠবে।[১৪]

মজনু শাহ্ একজন নির্ভীক সৈনিক। দেশের মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় কাঁদে। এদেশের সাধারণ মানুষের উপর যে জুলুম-অত্যাচার চলেছে, তিনি তার প্রতিকার করতে চেয়েছেন। তাই দেশবাসীর প্রতি মজনু শাহ্র উক্তি —

> প্রয়োজনে জালেমকে মেরে ফেলতে হবে। দাঁড়িয়ে থাকলেও মরবে। মরবেই যদি ভীরুর মতো দয়ার প্রত্যাশী হয়ে মরবে কেন? তোমরা এ দেশের লাখো মানুষ ওই এক শয়তানের ভয়ে তটস্থ হয়ে আছ।[১৫]

আলোচ্য নাটকের দিলারা চরিত্রটি নাট্যকারের সফল সৃষ্টি। আসকার ইবনে শাইখ দিলারাকে একজন মা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিকূল পরিবেশ বার বার দিলারার মাতৃত্বকে আঘাত করেছে। ক্রমেই সে হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী। দিলারার আশা ছিল — তার একটি ঘর থাকবে, থাকবে বাগান, এক চিলতে উঠোন — উঠোনে খেলবে ছোট্ট একটি শিশু — ডাকবে 'মা' বলে। মা ডাকে দিলারার মাতৃ-হৃদয়ে জাগে ভালবাসার আকুতি —

> শিশু কণ্ঠের যে ডাক নারীর মনকে বেহেশতের সুষমায় ভরে দেয়, আপনার মুখে সে ডাক কেন? ঘুমন্ত রাক্ষসীর ঘুম যে এতে ভেঙ্গে যায়। ছোট শিশু ; সাজানো ঘর, ফুল ফুটানো ঘরের আঙিনা। সন্ধ্যা সকাল দুবেলা ধুয়ে মুছে রাখবো সেই আঙিনা। দিনমান ভরে খেলা করবে সেই ছোট্ট শিশু। আধোকণ্ঠে ডেকে উঠবে — মা! আপনি কেন মা বলে ডাকলেন আমাকে?[১৬]

নাট্যকার অতীত বাংলার গণ-অভ্যুত্থানের কাহিনী রোমন্থন করে বাংলার মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন। দয়ালের সংলাপ নাট্যকারের সেই চেতনারই পরিচায়ক —

> পলাশী প্রান্তরে সেদিন আমরা সে সুখ-শান্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছি। পলাশীর সেই নিমকহারামীর পাপে বাংলা ছারখার হয়ে গেল।[১৭]

এই নাটকের দেওয়ান দেবী সিং নিষ্ঠুর মানুষ। সে পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর নির্মম নির্যাতন করে। দেবী সিং শুধু খাজনা আদায় করেই ক্ষান্ত থাকেনি, সাধারণ মানুষের শান্তির ঘর ভেঙে দিয়েছে, স্ত্রী-কন্যা ধরে এনে সাহেবদেরকে উপহার দিয়েছে। যে কোন মূল্যে দেবী সিং টাকা চায়, তাই সে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে —

> যারা খাজনা দিতে না পারবে, তাদের প্রতি দুজনকে শিকলে বেঁধে পাগুলো ঊর্ধ্বমুখে আর মস্তক অধোমুখে স্থাপন করে গাছের সঙ্গে বন্ধন করবে। তারপর প্রয়োজন হলে ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গে বিছুটির আঘাত করবে। হ্যাঁ, এ শাস্তি প্রকাশ্যেই হওয়া উচিত।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

দেবী সিংহের নৃশংস অত্যাচারে সমগ্র উত্তরবঙ্গে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে। রংপুর-দিনাজপুর এলাকা মহাশ্মশানে পরিণত হয়। কোম্পানীর রাজত্বকালে বাংলাদেশে যে অরাজকতা দেখা দেয়, দেবী সিংহের অত্যাচার সে-অরাজকতার এক নিষ্ঠুর কালো অধ্যায়। হেস্টিংসের যতগুলো প্রিয়পাত্র ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী পিশাচ প্রকৃতির ছিল এই দেবী সিংহ। নিম্নের বর্ণনা থেকে সাধারণ মানুষের উপর দেবী সিংহের অত্যাচার-কাহিনী অনুধাবন করা যায় —

> দেবী সিংহের পাইকবর্গ নিরীহ প্রজাগণের অঙ্গুলিতে রজ্জু বন্ধন করিয়া ক্রমাগত পাক দিতে দিতে অঙ্গুলিগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত এবং তাহারা যখন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত সেই সময় হাতুড়ি দ্বারা তাহা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া একেবারে অকর্মণ্য করিয়া দিত। গ্রামের মণ্ডল, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য প্রধান বর্গের দুই দুই জনকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া পদদ্বয় ঊর্ধ্বমুখে ও মস্তক অধোমুখে লম্বমান করিয়া পদতলে বেত্রাঘাত করিতে করিতে অঙ্গুলি হইতে নখগুলি বিচ্যুত করিয়া দিত। অবশেষে মস্তকে আঘাত করিয়া মুখ, চক্ষু ও নাসিকা হইতে রুধির বহির্গত না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। বেত বা লাঠি দ্বারা যদি পদে অধিক কষ্টবোধ না করে, এই ভাবিয়া সেই কৃতান্তের অনুচরেরা কণ্টকপূর্ণ বিল্বশাখার দ্বারা তাহাদের ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরও ক্ষত-বিক্ষত করিত। তাহার উপর বিছুটির আঘাত করিয়া অপরিসীম যন্ত্রণায় তাহাদিগকে মৃতকল্প করিয়া তুলিত। যখন প্রজাগণ আরণ্য পশুর ন্যায় দলে দলে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না, আপনাদিগের সম্মুখে দিন দিন স্ত্রী-কন্যার পবিত্রতা ও অগ্নিমুখে আপনাদের কুটিরগুলি ভস্মীভূত হইতে দেখিতে লাগিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। এই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উত্তরবঙ্গের প্রজাগণ ঘোর বিদ্রোহের অবতারণা করিল।[১৯]

পরাধীন ভারতে হেস্টিংস-এর রাজত্বকালে কোম্পানীর প্রতিনিধি দেবী সিংহ খাজনা আদায়ের নামে রংপুর-দিনাজপুরের কৃষককুলের উপর চালিয়েছিল বর্বরোচিত নৃশংস অত্যাচার। দেবী সিংহের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফকির মজনু শাহ্-র নেতৃত্বে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। মজনু শাহ-র সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক এবং রানী ভবানী। এঁরা সমবেতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।[২০]

এই প্রজাবিদ্রোহ ও ফকীর-আন্দোলন এক না হলেও প্রজাদের দুর্দশার দিনে ফকীর নেতা মজনু শাহ্ প্রজাদের পাশে এসে দাঁড়ান। হেস্টিংসের গোলাম দেবী সিংহ ও কোম্পানীর অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তিনি সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। দেশের হিন্দু-মুসলমানকে মজনু শাহ্ দুশমনদের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে সংগ্রামের শপথ নিতে আহ্বান জানান। মজনু শাহ্ এবং তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে কোম্পানীর সৈন্যদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সিপাহীদের হাতে কোম্পানীর সেনাপতি ক্যাপ্টেন ব্রেনাল নিহত হয়। এই সংঘর্ষে শত্রুদের গুলিতে মজনু শাহ্‌ও শহীদ হন। কিন্তু বিপ্লবের যে বীজ তিনি বপন করে যান, তা-ই তাঁর অন্তিম কণ্ঠে শোনা যায় —

> পরাস্ত আমরা কোনদিন হব না। গড় থেকে অন্য গড়ে, গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গড়ে উঠবে আমাদের এমনি প্রতিরোধ ব্যবস্থা। জন্মভূমিকে আমরা বিদেশীদের কবল থেকে মুক্ত করব। এই আমাদের পণ। ... সেদিন বেশী দূরে নয়। আজ না হোক, কাল সেই স্বর্ণপ্রভাতে আমার দেশ আবার হেসে উঠবে।[২১]

আসকার ইবনে শাইখ জাতীয় ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়কে *অগ্নিগিরি* নাটকের মাধ্যমে আমাদের সামনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার গণঅভ্যুত্থানের নেতা মজনু শাহ্‌কে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নির্মাণ করেছেন। আসলে মজনুর সংগ্রাম ছিল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম — জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম, লাঞ্ছিত মানবতাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নাট্যকার তার সে-সংগ্রামকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। এই নাটকের সংগঠন, চরিত্র-চিত্রণ ও সংলাপ নৈপুণ্য-ঋদ্ধ। নাট্যকারের জীবনদর্শন মানবতাবোধ ও দেশপ্রেমে সমুজ্জ্বল। নাটকীয় সংঘাত, উৎকণ্ঠা, মানবীয় চিত্তবৃত্তির যন্ত্রণাময় সংক্ষোভ যেন 'অগ্নিগিরি'র দাহ্য উদ্‌গীরণ। এর সংলাপ মর্মগ্রাহী, বলিষ্ঠ ও অগ্নিগর্ভ। অবশ্য মাঝে-মধ্যে ঐতিহাসিক নাটকের প্রচলিত বক্তৃতাধর্মিতাও এখানে লক্ষ করা যায়। একদিকে *অগ্নিগিরি* ইতিহাসের একটি প্রামাণিক মানচিত্র, কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টিতে তার চেয়েও বেশী আগ্রহ মানুষ — তাই নাট্যকার ইতিহাসের ইংরেজ ও দেবী সিংহের নৃশংসতা এবং মজনু শাহ্‌র প্রতিরোধের প্রেক্ষিতে কাসেম, দয়াল, দিলারা, আমিনা প্রমুখের মর্মান্তিক আলেখ্য নির্মাণ করেছেন।[২২]

আসকার ইবনে শাইখ *অগ্নিগিরি* নাটকে প্রথাসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকের রীতি অনুসরণ করেছেন। তারপরও এই নাটক কাহিনীর দ্রুতগামিতায়, সুদৃঢ় সংলাপে এবং মৌল জীবনার্থ প্রকাশে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় সংযোজন করেছে একটি বিশিষ্ট মাত্রা।

অনেক তারার হাতছানি

অনেক তারার হাতছানি আসকার ইবনে শাইখের সর্বশেষ ঐতিহাসিক নাটক। পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকে কোন দৃশ্য-বিভাগ নেই। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঢাকায় সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোচ্য নাটক গড়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নাটকটি ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে রচিত। ১৯৬২'র কোন এক রাতে ভিক্টোরিয়া পার্কের শহীদ মিনারে একদল তরুণ পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে এসেছে শতবর্ষ পূর্বের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে উৎসর্গিত প্রাণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায়। এভাবেই উন্মোচিত হয়েছে নাটকের পট।

শহীদ মিনারের পাদদেশে থাকেন একজন পাগলাটে লোক। তার সঙ্গে দেখা হয় এক সন্তান-হারা দুঃখিনী মা'র। সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় রহিম নিখোঁজ হয়েছে — তার দাদু ও মা এসেছেন তারই খোঁজে। বলা বাহুল্য, রহিম স্বৈরাচারী শক্তির থাবায় নিহত হয়েছে। এই পাগলাটে লোকটি ছিলেন একজন অধ্যাপক — সত্যিকার মানবপ্রেমিক আর দেশপ্রেমিক। একশো বছর আগে যে নির্মম ইতিহাস এখানে রচিত হয়েছিল তাঁর চোখে তা ক্রমেই বিশেষ রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি সেই তরুণ-উৎসর্গিত প্রাণের কান্না যেন শুনতে পান। একথা তিনি রহিমের মা ও দাদুকে জানালেন। তাদের সামনে মেলে ধরলেন ১৮৫৭'র মর্মন্তুদ কাহিনী।

১৮৫৭ সালে কানপুর-দিল্লীর বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতে। ঢাকায়ও লাগল তার ঢেউ। বিদেশী বেনিয়ার শ্বাসরোধকারী শোষণের বিরুদ্ধে এখানকার তরুণ সিপাহীরাও সশস্ত্র বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহে দেশের সকল মানুষের সঙ্গে শরীক হল এক দুঃখিনী মা'র একমাত্র সন্তান হাসান। হাসানের দাদু মজনু শাহ্‌র (ফকীর-আন্দোলনের নেতা) প্রাণ-মাতানো আহ্বানে সাড়া দিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন। তার পিতা তিতুমীরের সহকর্মী রূপে বেনিয়াদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। সুতরাং হাসানও অনুসরণ করল পূর্ব-পুরুষের পথ।

হাসানের মা'র আশা ছিল ছেলে বিয়ে-শাদী করে সংসারী হবে। কিন্তু হাসান ছিল তার নাগালের বাইরে। বিয়ে সে করেছিল। কিন্তু সংসারী হবার সময় পায়নি। বিপ্লবীদের ডাকে সে ঘর ছেড়েছিল। বেনিয়া-গোলাম পীতাম্বর পত্নী সৌদামিনী হাসানের দলের কর্মী। তারই উদ্যোগে হাসান যুদ্ধে যাবার পূর্ব মুহূর্তে জেবুন্নেসাকে গ্রহণ করল স্ত্রীরূপে। নবজীবনের মধুর স্পর্শের চেয়ে কর্তব্যের কঠিন আহ্বান তখন অনেক বড়।[২৩]

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজদের হস্তগত হয়ে যায়। এদেশেরই কিছু বিশ্বাসঘাতক হীনস্বার্থে এই দেশকে ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দেয়। পরাধীন ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে এক সময় প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এদেশ থেকে ইংরেজরা সম্পদ লুট করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাচ্ছে অথচ এদেশের মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। অতিরিক্ত করের বোঝা মাথায় নিয়ে কৃষকরা দিনে দিনে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় এদেশের কিছু

Dhaka University Institutional Repository

বীর সন্তান বিদ্রোহ করে — সমস্ত অন্যায় অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলন শুরু হয়।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ঠিক নয়, কতিপয় অভিযোগ প্রকাশের জন্য ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গল আর্মির সৈন্যরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তবে এর চেয়ে ইংরেজ সরকারকে যা অধিকতর বিব্রত করে তুলেছিল তা হচ্ছে — সন্ন্যাসী ও ফকীরদের বিদ্রোহ। ফকীর মজনু শাহ্ ছিলেন এই বিদ্রোহের নেতা।[২৪]

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী প্রবর্তিত সংস্কার-আন্দোলন এবং তা থেকে উদ্ভূত জেহাদের প্রতি বিপুল সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল বাংলাদেশ থেকে। পশ্চিম বাংলায় এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন মৌলভী নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। এঁরা এদেশে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ও মুসলিম শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। একটি নীলকুঠি আক্রমণ করে তার তত্ত্বাবধায়ককে তাঁরা বন্দী করে নিয়ে যান। এঁদেরকে দমন করতে এসে পরাজয় মানতে বাধ্য হয় বসিরহাটের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার আর কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট স্কট। এরপর ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আলেকজান্ডার ও স্কটের মিলিত অভিযান শুরু হয়।

বাঁশের কেল্লার ভেতর থেকে তিতুমীর যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু বাঁশের কেল্লা আর কতক্ষণ আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র প্রতিরোধ করতে পারে? শেষ পর্যন্ত তিতুমীর আর তাঁর বহু অনুসারী নিহত হলেন। তিতুমীরের বিদ্রোহের কাহিনী থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, তাঁর মূল অভিপ্রায় ছিল প্রচলিত ইসলাম ধর্মের সংস্কারসাধন।[২৫]

অনেক তারার হাতছানি নাটকে আসকার ইবনে শাইখ এই আন্দোলনে যে-সকল বীর-যোদ্ধা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সংগ্রামী জীবনকাহিনীর নাট্যরূপ দিতে চেয়েছেন। এখানে হাসান নামের যে সিপাহী বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তাঁর দাদু তিতুমীরের দলে যোগ দিয়েছিলেন। নাট্যকার এভাবে ইতিহাসকে সামনে রেখে নাটকের চরিত্রগুলোকে নির্মাণ করেছেন।

পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ একটি জটিল সমস্যা রূপে পরিগণিত। এই অভ্যুত্থানের স্বরূপ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতান্তরের শেষ নেই। কেউ কেউ একে ধর্মান্ধ সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসেবে দেখেছেন, কেউ-বা একে মনে করেছেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। আবার অনেকেই একে চিত্রিত করেছেন এদেশবাসীর প্রথম স্বাধীনতা-সমর হিসেবে। মনে হয়, অভ্যুত্থানটির মধ্যে এই সব ক'টি লক্ষণই সমীকৃত হয়েছিল।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

এই বিদ্রোহের প্রথম উপলক্ষ হিসেবে ধরা হয় নতুন ধরনের কার্তুজের ব্যবহার। এটি দাঁত দিয়ে কাটতে হত। ধারণা করা হয় এর মধ্যে শূকর আর গরুর চর্বি মেশানো ছিল। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই বড় রকম অভ্যুত্থানের পশ্চাতে আরো কতগুলো গুরুতর কারণ ছিল। তার একটি হচ্ছে তখনকার ভূমি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। আত্মশক্তিতে সিপাহীদের অত্যুগ্র বিশ্বাসও তাঁদেরকে বিদ্রোহ ঘোষণায় প্ররোচনা দেয়। তাঁরা জানত যে, বার্মা থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভারত তাঁদেরই বাহুবলে কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়েছে। সিপাহীদের সাহায্য ছাড়া কোম্পানীর রাজত্ব ছায়ার মত মিলিয়ে যাবে। তাই তাঁদের দাবী মেনে নিতে কোম্পানী বাধ্য। সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে তাই কোম্পানী আমলে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তরা এবং সত্যকার স্বাধীনতাকামীরা এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। তখনই তা ব্যাপক গণবিদ্রোহে পরিণত হলো।

তবু এই বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তার কারণ সিপাহীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং কোম্পানী কর্তৃক এদেশবাসীকেই এদেশবাসীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার কূটকৌশলের রাজনীতি। তবু সিপাহীদের বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। আর এই গণ-অভ্যুত্থানের পশ্চাতে মুসলমানদের ভূমিকা যে সক্রিয় ও প্রধান ছিল, এতে সন্দেহ নেই।[২৭]

অনেক তারার হাতছানি নাটকে সিপাহী হাসান চরিত্রটিকে নাট্যকার সিপাহী বিদ্রোহের উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে অঙ্কন করেছেন। হাসান ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

পরবর্তিতে এসেছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেই পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্যও বাংলার নেতৃবৃন্দের কাছে উন্মোচিত হয়। কিন্তু ততদিনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের ওপর দখল সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে, যা উচ্ছেদ করতে পরবর্তী চব্বিশ বছরের সাধনা ও সংগ্রামের প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশকে চির পরাধীন রেখে শোষণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল এই মর্মে ঢাকায় ঘোষণা করে যে, উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই সারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক বাঙালি হলেও উর্দুকে বাঙালিদের ওপর তারা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলার জনগণ প্রতিবাদে মুখর হয়ে গণআন্দোলন করে।

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও গুলিবর্ষণ চলতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২১ ফ্রেব্রয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের অদূরে ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলের ওপর পুলিশের গুলীবর্ষণে ছাত্রনেতা বরকত, সালাম ও আরো অনেকে শহীদ হন। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই বাংলার যুবসমাজ প্রাণ বিসর্জন দিল। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আত্মোৎসর্গের নজীর নেই।

অনেক তারার হাতছানি নাটকে রহিম চরিত্রটি সম্ভবত এই ভাষা-আন্দোলনের শরীক হতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। এখানে নাট্যকার তিনটি প্রজন্মকে তিনটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি অখণ্ড-সূত্রে গ্রন্থিত করেছেন।

আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হাসান। দেশ ও জাতি সম্পর্কে সে সচেতন। তাই সে যখন দেখেছে ইংরেজরা এদেশের মানুষের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করছে, জুলুম করছে তখন সে স্থির থাকতে পারেনি। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরী করেও সে প্রতিবাদ করেছে এবং সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। হাসান তার মা ও দাদুর ইচ্ছা অনুযায়ী বিয়ে করতে অসম্মত হয়েছে এ কারণে যে — দেশ যখন পরাধীনতার জালে আবদ্ধ, সেখানে সে কিভাবে বিয়ে করবে। তাই সে বলে —

> শুধু এ বাড়ীতে নয় দাদু, এ দেশের ঘরে ঘরে এমনি শূন্য হাহাকার। তোমার চোখে আজও সেই আজাদ দেশের স্বপ্ন। কি করে বুঝাব তোমাকে, এই হাহাকারের বেদনাই আজ এই গোলামের দেশে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে।[২৮]

হাসানের দাদুর চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের ফলে ভারতের নিপীড়িত জনগণ প্রতিবাদী হয়েছে। এরকম প্রতিবাদী একজন মানুষ হাসানের দাদু। যিনি দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য নিজ স্বার্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাই তিনি বলেন —

> হাসান! তোর দেহের শিরায় শিরায় বইছে এমন রক্ত, তোর খান্দানে এমন ঐতিহ্য, দুঃখের সাগরে পাড়ি জমাতে যা ভয় পায় না। জুলুমের প্রতিবাদে মৃত্যুর সঙ্গে যা পাঞ্জা ধরায়, প্রিয়জনের চোখের পানি মুছে দিয়ে যা চলার পথকে এগিয়ে দেয়। সে রক্ত, সে ঐতিহ্য তোমার হাসান, তোমার। তুমি কি পার আজ দেশের এ ডাক শুনে — (হঠাৎ যেন খেয়াল হল) ... একি হাসান! এ আমি কি বলছি ? কথায় ভুলিয়ে এ কি কথা তুই ওঠালি হাসান ? ও বউ! বউ-মা! শুনছ?[২৯]

আলোচ্য নাটকের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সন্তানহারা মা। মা'র কাছে সন্তানের চেয়ে প্রিয় এবং আপন কোন কিছু এই পৃথিবীতে নেই। সেই সন্তান যখন মাকে ছেড়ে চলে যায় তখন মাতৃহৃদয় বেদনায় আপ্লুত হয়ে যায়। সময়ের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু মায়ের চিরন্তন আবেগ, স্নেহ, ভালোবাসার কোন পরিবর্তন নেই। তাই

Dhaka University Institutional Repository

রহিমকে হারিয়ে যেমন তার মা শোকাহত, ঠিক তেমনিভাবে অন্য একটি সময়ের হাসানের মা-ও ছেলে হারাবার ভয়ে ব্যাকুল —

> ওসব কিছু নয় আব্বাজান। হাসান, আমি জানি পলাশীর জ্বালা, মজনু শাহ্, তিতুমীরের ব্যর্থ প্রয়াস তোদের রক্তে রক্তে কি কথা কয়ে যায়। আমি জানি, তোর দাদুকে সে কথা শুনিয়ে তুই সেই রক্তের দোলা অনুভব করতে চাস। এবার তোকে দেখেই আমার বুক এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাসান, তোর মনের কথা খুলে বল।[৩০]

নাট্যকার সমকালীন দেশ-কালকে সুস্পষ্টভাবেই উপস্থাপিত করেছেন বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। ১৯৬২ সালের পরের ঘটনায় এক মধ্যবয়সী অধ্যাপক, নাটকে যাকে পাগলাটে লোক বলা হয়েছে, নাট্যকারের মানস-সন্তান তিনি। পাগলাটে অধ্যাপক নাট্যকারের আদর্শের প্রতীক।[৩১] এখানে পাগলাটে লোকটা অনেকটা বিবেকের মত সত্য-দ্রষ্টা। তিনি যেন অনেক কালের সাক্ষী হয়ে সমস্ত ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাই তার মুখে শোনা যায় —

> এতেই হবে মা, এতেই হবে। একশ' বছরের দুই প্রান্তে দুই মা, দুই ছেলে। তোমরা এক হয়ে কত ছেলে, কত ছেলের মনের কথা দিয়ে এক রোদন ভরা কাহিনীকে আপন করে নিয়েছ। .... ঐ দেখ মা, আসমানে কত তারা ফুটেছে! সব তারার ফুল। কালো রাতে ওসব তারার ফুল ফোটে। আর ঐ দেখ ছায়াপথ। তারায় তারায় গড়া, তারার আলোয় ভরা এক পথ। ওদেরই হাতছানি এক সময়ের সাগর পেরিয়ে অন্য সময়ে পৌঁছয়।[৩২]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল বিদেশী নাগপাশ থেকে এ দেশকে মুক্ত করার প্রয়াস। আর এ-জন্য অসংখ্য দেশপ্রেমিক নাগরিককে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছিল সেদিন। অপরদিকে সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে পাক-শাসিত বাংলাদেশে এ-দেশের মানুষকে মাতৃভাষার মর্যাদার জন্যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে বারবার জীবন দিতে হয়েছে। এই ইতিহাস-চেতনার পুনরুল্লেখের মধ্য দিয়ে নাট্যকার এদেশের তরুণসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন অন্যায়-অবিচার-নিপীড়ন আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে।[৩৩]

নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ *অনেক তারার হাতছানি*-তে যে চিত্র এঁকেছেন, তা প্রতিটি দেশপ্রেমিকের প্রাণে জাগাবে সাড়া, আনবে দেশের মুক্তিকামী শহীদানের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবোধ। ঐতিহাসিক নাটকের এ এক নতুন রূপ। 'সেই মর্মান্তিক কাহিনী যুগে যুগে নতুন করে রচিত হয়' — এই দুঃখ শুধু পাগলাটে লোকটার নয়, নাট্যকারের, দেশের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের, আপামর জনগণের এবং অধিকার-মত্ত বিশ্বমানবের। ঐতিহাসিক নাটকের এ শিক্ষা ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী গণদুশমনদের নির্লজ্জ থাবার প্রতি বিক্ষুব্ধ প্রাণের শুধু কটাক্ষই নয়,

Dhaka University Institutional Repository

প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহও। নাট্যকারের এই সুমহান অঙ্গুলি নির্দেশ শিল্প-সুষম এবং মানব ও দেশপ্রেমের অন্তরঙ্গ প্রকাশ।

আলোচ্য নাটকে ১৮৫৭-র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। দেশের মানুষ তাদের পূর্ব-পুরুষের আত্মত্যাগের সেই আদর্শে হবে সংগঠিত এবং সত্য-সন্ধ তরুণ সম্প্রদায়কে সেই বেদনার্দ্র উৎসর্গ দেবে হাতছানি। এই নাটকের কাহিনী পরিকল্পনা এবং জীবন-দর্শন নবতর বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।[৩৪]

অনেক তারার হাতছানি নাটকে ঐতিহাসিক আন্দোলনগুলোকে আমাদের জাতীয় চেতনার প্রেরণার উৎস হিসেবে দেখা হয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে এ-দেশের সাহসী সন্তানেরা প্রতিবাদ করেছে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য। আলোচ্য নাটক ঐতিহাসিক আন্দোলনের পরিভ্রমণে নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা,* (রাজশাহী : নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭০), পৃ. ৫১৫-৫১৬

২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিমমানস ও বাংলা সাহিত্য* , (ঢাকা : পাকিস্তান লেখক সংঘ, ১৯৬৪), পৃ. ৫৩-৫৫

৩. আসকার ইবনে শাইখ, *রক্তপদ্ম,* (ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, সং. ১৯৭০), পৃ. ৭৬-৭৭

৪. ঐ, পৃ. ৪২

৫. ঐ, পৃ. ৩০

৬. ঐ, পৃ. ৩২

৭. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা* , (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ২৬৩-৬৪

৮. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা,* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান,১৯৬৮), পৃ. ৪৬২

৯. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৭

১০. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-২৪

১১. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১১

১২. নীলিমা ইব্রাহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬০

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আসকার ইবনে শাইখ, *অগ্নিগিরি,* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৫৯), পৃ. ৪৩
১৪. ঐ, পৃ. ৭৭-৭৮
১৫. ঐ, পৃ. ৪৭
১৬. ঐ, পৃ. ২৩
১৭. ঐ, পৃ. ১১
১৮. ঐ, পৃ. ৯
১৯. নিখিলনাথ রায় : মুর্শিদাবাদ-কাহিনী (কলকাতা : কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৬২), পৃ. ৫১৩-১৪
২০. সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০
২১. *অগ্নিগিরি,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
২২. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৪-১৫
২৩. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৭-১৮
২৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
২৫. ঐ, পৃ. ৪৯-৫০
২৬. ঐ, পৃ. ৫৩
২৭. ঐ, পৃ. ৫৫
২৮. আসকার ইবনে শাইখ, *অনেক তারার হাতছানি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫), পৃ. ৪০-৪১
২৯. ঐ, পৃ. ৪১-৪২
৩০. ঐ, পৃ. ৪২
৩১. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৮-১৯
৩২. *অনেক তারার হাতছানি,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
৩৩. সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫-৬৬
৩৪. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সাঈদ আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সাঈদ আহমদ

সাঈদ আহমদ (জ. ১৯৩১) বাংলাদেশের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ভিন্ন একটি ধারার সূচনা করেছেন। তাঁর সাধনার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের সাথে বিশ্ব নাটকের সংযোগ সাধিত হয়েছে। আবহমান কালের ঐতিহ্য আর বর্তমানের জিজ্ঞাসা অবলীলায় তাঁর নাটকে সমন্বিত হয়েছে। আঙ্গিকের এই সাফল্যই তাঁর অসামান্যতা। সাঈদ আহমদের নাটক সম্পর্কে কবি শামসুর রাহমান অভিমত ব্যক্ত করেছেন — "সাঈদ আহমদ নাটক লিখে তাঁর পরবর্তী নাট্যকারদের কাজ বেশ কঠিন করে দিয়েছেন। হেলাফেলা করে, যেনতেন প্রকারে নাটক রচনান্তে শিরোপা লাভের কোন উপায় নেই আর। নাট্যক্ষেত্রে নিজস্ব স্বাক্ষর রাখতে হলে একজন নাট্যকারকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তা সাঈদ আহমদ-এর নাটকসমূহ পাঠ করলে কিংবা দেখলে বোঝা যায়। পাশ্চাত্য উপকরণের সঙ্গে দেশজ উপাদান মিশিয়ে নাটক লেখার সর্বপ্রথম সার্থক উদ্যোগ আমাদের দেশে সম্ভবত সাঈদ আহমদই নিয়েছেন। তাঁর নাটকে অ্যাকশন বলতে গেলে প্রায় অনুপস্থিত, তিনি আমাদের বাধ্য করেন নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংলাপে কান পেতে রাখতে। এতটুকু অমনোযোগী হবার জো নেই। তাদের কথাবার্তা অবলীলাক্রমে আমাদের জীবনের গভীরে নিয়ে যায়, জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলোকে তুলে ধরে আমাদের সামনে। এ কাজটি যিনি দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন তিনি তর্কাতীতভাবে অসামান্য। তাই সাঈদ আহমদ সম্পর্কে যদি কেউ 'অসামান্য' শব্দটি প্রয়োগ করেন তাহলে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা কঠিন।"[১]

সাঈদ আহমদ-এর একমাত্র ঐতিহাসিক নাটক *শেষ নবাব* (১৯৮৯)। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়ক নবাব সিরাজদ্দৌলা। সিরাজদ্দৌলাকে নায়ক করে বাংলা ভাষায় এর আগে বেশ কয়েকটি নাটক লেখা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শচীন সেনগুপ্ত ছাড়াও এ বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করেছেন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ। এসব নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শচীন সেনগুপ্তের নাটক

Dhaka University Institutional Repository

দু'টিই বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিশেষ করে শচীন সেনগুপ্তের নাটকটির শেষ পর্বের বহু সংলাপ একদা বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে, এখনো হয়।২ এছাড়া সিকান্‌দার আবু জাফরের *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (১৯৬৫) বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় বিশিষ্ট সংযোজন হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ কিংবা শচীন সেনগুপ্ত অপেক্ষা সিকান্‌দার আবু জাফরের *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* অনেক বেশী বাস্তবমুখী।

সাঈদ আহমদের *শেষ নবাব* সমকাল-স্পর্শী একটি নাটক। এই নাটকে সিরাজদ্দৌলা অনেক বেশী প্রাঞ্জল এবং সাবলীল। "যে বিষয় নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শচীন সেনগুপ্তের মতো নন্দিত নাট্যকার লেখনী চালনা করেছেন, সে-বিষয় অবলম্বনে নতুন করে নাটক লেখা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। সাঈদ আহমদ আত্মপ্রত্যয়ী সৃজনশীল নাট্যকার, ফলে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠিত। তাছাড়া নাটক লেখার সময় সাঈদ আহমদ-এর পেছনে একটি চিন্তা সব সময় জাগ্রত ছিলো, সিরাজদ্দৌলা-বিষয়ক দু'টি জননন্দিত নাটক আমাদের নাট্যসাহিত্যে ভাস্বর হয়ে আছে। নাটক দু'টির সাফল্য যে কোন নাট্যকারের পথে মস্ত বাধা। এই বাধা অতিক্রম করা দুরূহ কর্ম।"৩ সাঈদ আহমদ এই কাজটিও যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করতে চেষ্টা করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শেষ নবাব-এর ঘটনাংশ নিম্নরূপ — বাংলার নবাব আলীবর্দী খান মৃত্যুর সময় নবাবী তাঁর ছোট মেয়ে আমিন বেগমের পুত্র সিরাজদ্দৌলাকে দিয়ে যান। আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম সিরাজকে নবাব হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। উচ্চাভিলাষী এই মহিলার ইচ্ছা ছিল অযোগ্য, মদ্যপ শওকত জঙ্গকে ক্ষমতায় বসিয়ে তিনি নেপথ্যে থেকে সাম্রাজ্য পরিচালনা করবেন। সিরাজ নবাব হওয়ায় সেটা সম্ভবপর নয়। তাই তিনি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তার সাথে যোগ দিলেন নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খান। মীর জাফর আলীবর্দী খানের ভগ্নিপতি। আলীবর্দীর আমল থেকে তিনি প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে এসেছেন। সিংহাসনের প্রতি ছিল তার প্রচণ্ড লোভ। এদের সাথে যোগ দেয় জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতি স্বার্থপর ব্যক্তি। নবাব দক্ষতার সাথে ঘসেটি বেগমকে নজর বন্দী ও শওকত জঙ্গকে প্রতিহত করেন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ তিনি দখল করলেও পরবর্তীতে তা বজায় রাখতে পারেননি। শওকত জঙ্গ নিহত হলে কুচক্রীরা মীর জাফরের নেতৃত্বে গোপনে ইংরেজদের সাথে হাত মেলায়। ইংরেজরা আগে থেকেই নবাবের পতনের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। কারণ সিরাজ ব্যবসার নামে সাধারণ মানুষের উপর ইংরেজদের শোষণ ও অত্যাচারকে সহ্য

Dhaka University Institutional Repository

করতেন না। ১৭৫৭ সালের জুন মাসে ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনী পলাশীর প্রান্তরে নবাবের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখী হয়, ২৩ জুনের যুদ্ধে মীর জাফর ও স্বার্থপর ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নবাবের পরাজয় ঘটে।

সাঈদ আহমদ পূর্ববর্তী নাট্যকারদের ধারা অনুসরণ করেননি। তাঁর *শেষ নবাব* নাটক গড়ে উঠেছে তিনটি অঙ্কে। নাটকে কোন দৃশ্য বিভাজন নেই। তিনি তাঁর নাটকে প্রত্যক্ষতাবোধ ও রচনাশৈলীর ঘনবদ্ধতা বজায় রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কোনো রকম বাহুল্য কিংবা ফ্যান্টাসিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। অথচ এই বিষয় নিয়ে লেখা পূর্ববর্তী নাটকগুলোর মধ্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শচীন সেনগুপ্ত উভয়েই সিরাজদ্দৌলা-চরিত্রের গাম্ভীর্য যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হননি। সিরাজ যখন রমণীদের সান্নিধ্যে আসেন তখন তাঁর আচরণ নবাবসুলভ থাকে না। চাপল্য প্রকট হয়ে ওঠে। তখন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের চিত্তে সংশয় জাগে। কিন্তু সাঈদ আহমদ বাংলার শেষ নবাবের চরিত্রের আভিজাত্য ও সংযমী রূপটি সৃষ্টি করেছেন বিশ্বস্তভাবে। নাটকের কোন অংশেই সিরাজদ্দৌলাকে লঘু কিংবা চটুল চিত্তের ব্যক্তি বলে মনে হয় না। যাঁর ভাগ্যের সঙ্গে বাংলার নিয়তি জড়িত, তিনি কী করে মেতে উঠবেন চপলতায়? সাঈদ আহমদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের একজন নতুন সিরাজদ্দৌলা উপহার দিয়েছে। তিনি নাটকের নন্দনতাত্ত্বিক দিক সম্পর্কেও সচেতন। এই সচেতনতা তাঁকে এটা উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে যে, নাট্যকার চরিত্রের রূপায়ণে যদি শুধু সাদা কিংবা কেবল কালো রং-এর দিকেই ঝোঁকেন, এর মাঝখানকার কোন বর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত না করেন, তাহলে উঁচুদরের নাটক রচনায় তিনি সার্থক হতে পারেন না।[৪] আলোচ্য নাটকে সিরাজকে নাট্যকার অনেকখানি গুরুগম্ভীরভাবে উপস্থাপন করেছেন। রাজনীতি এবং সমরনীতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন। পরিবেশ-পরিস্থিতি তিনি খুব ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন। তাই দেখি ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ঘসেটি বেগমকে তিনি নজরবন্দী করার আদেশ দেন, শওকত জঙ্গকে প্রতিহত করেন। যিনি বাংলার স্বাধীন নবাব তাঁর আচরণের মধ্যে দৃঢ়তার ছাপ সাঈদ আহমদ অত্যন্ত সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাই প্রত্যয়দীপ্ত সিরাজের মুখে উচ্চারিত হয় —

> মুর্শিদাবাদকে সহজ, সরল, স্বাভাবিক করতে হবে। শান্তি আমাদের চাই। আজকের পদক্ষেপগুলো সম্ভব একটু বেশী শক্ত হয়ে গেছে। বামে কর্নেল ক্লাইভ, মাঝখানে মীর জাফর এবং ডাইনে ঘসেটি বেগম। সবার লক্ষ্য বাংলার তখ্‌ত। সবাই বসতে চান এই কুরশিতে। ক্লাইভ এই দেশের সবচেয়ে দুর্বল স্নায়ুর সন্ধান পেয়ে গেছেন। টাকার লোভ সামলাতে পারে এমন লোক আমার রাজ্যে বোধহয় আর বেশী নেই। আমি ইংরেজদের চিনি। চাইলে আমিও ইংরেজদের সঙ্গে রফা করতে পারি। অল্প স্বল্প বাণিজ্যিক ফায়দা দিলে ওরা আমার পা চাটতে রাজী। আরাম আয়েশে আগামী দিনগুলো কাটাতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

> দিল্লীর সুলতান এরই মধ্যে অজস্র টাকা নিয়েছেন আর যাকে তাকে সনদ দিয়েছেন। সেই পথ অনুসরণ করতে আমাকে অনেকে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু আমি করবো না। করতে পারি না। বাংলাদেশে বিদেশীদের চোখ রাঙানী সহ্য করবো না। যদি কেউ ইজ্জত খর্ব করতে চায়, তাহলে রক্তের বন্যা বইয়ে দেব। কিন্তু একি সম্ভব? আমার রাজ্যে একতার দুর্ভিক্ষ। প্রত্যেকেই নিজেকে একজন ক্ষুদে নবাব মনে করেন এবং বড় নবাব হবার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন। ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দী রাখা, রাজবল্লভকে কৃষ্ণদাসের লুটকরা টাকা থেকে বঞ্চিত করা এবং মীরজাফরকে সঙ্গীহীন করাই আমার লক্ষ্য। মোহনলাল, মীরমর্দন, সাঁফ্রো আমার সঙ্গে আছেন।
>
> আলীবর্দ্দী খাঁর নাতী নানার কোলে বসে দাবা খেলা শিখেছে। এখন পর্যন্ত চালে ভুল করেনি।[৫]

শেষ নবাব নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র ঘসেটি বেগম। আলীবর্দী খার প্রথম কন্যা ঘসেটি বেগম ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তার যুক্তি এরকম — যেহেতু আলীবর্দীর কোন পুত্র সন্তান নেই এবং কন্যাদের মধ্যে সে-ই বড়, সেহেতু মসনদের প্রতি তার দাবী সবচেয়ে বেশী। ঘসেটী বেগম ছিলেন বুদ্ধিমতী, তাই সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি পরিণত হয়েছেন। পূর্ববর্তী নাটকগুলোকে ঘসেটি বেগমকে শুধু লোভী, নীচ, স্বার্থপর হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সাঈদ আহমদের *শেষ নবাব* নাটকে ঘসেটি বেগম একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা, যিনি তার নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তাই ঘসেটি বেগমের মুখে শোনা যায় —

> আমি মহিলা বলে আমার কি মসনদে বসার অধিকার নেই? বিদ্যা, বুদ্ধি, রণকৌশল কোন্ দিকে আমি আপনাদের চেয়ে কম? ভাল করেই জানেন এই মুর্শিদাবাদে আমাকে হারাতে পারে এমন মেধাবী ব্যক্তি কেউ নেই।
>
> ষোল আনা ভুল। রাজিয়া সুলতানা কি দিল্লীর সিংহাসনে বসে রাজকার্য চালান নি? চাঁদ বিবি কি বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধরেননি ? খনার বুদ্ধিমত্তার সামনে সমগ্র উজ্জয়িনী কি মাথা নোয়ায়নি? যে ইংরেজদের সান্নিধ্য লাভের জন্য মুর্শিদাবাদের আমির-ওমরাহরা উঠে পড়ে লেগেছেন, তাদের দেশেও এক মহিলা রানী এলিজাবেথ মসনদে বিরাজমান ছিলেন। তাঁর সৈন্য-সামন্ত পৃথিবী জয় করেছে। চোখের সামনে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। চোখ খুলে আপনারা দেখতে চান না। কিভাবে দেশ চালাতে হয় তা আমি জানি। আমি নিশ্চয়ই পারবো। ইতিহাস থেকে কি বাঙ্গলার মুলুক কিছুই শিখবে না ?[৬]

ঘসেটি বেগম বাস করতেন মুর্শিদাবাদের সুরম্য মতিঝিল প্রাসাদে। ঢাকার নওয়াজেস মোহাম্মদের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের সহায়তায় ঘসেটি বেগম

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবাব যথাসময়ে এই ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে মতিঝিল প্রাসাদ থেকে ঘসেটি বেগমকে সরিয়ে রাজপ্রাসাদে এক প্রকার বন্দী করে রাখেন এবং তাঁর যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন।

শেষ নবাব নাটকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মীরজাফর আলী খান। সাঈদ আহমদ এই চরিত্রটির মধ্যে চতুরতা ও বিচক্ষণতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সিকান্দার আবু জাফরের *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* নাটকে মীর জাফর লোভী, স্বার্থপর — কিন্তু আলোচ্য নাটকে মীর জাফর অনেকখানি সচেতন মানুষ, নিজ লাভ-লোকসানের খতিয়ান তিনি ভালো করেই বোঝেন। তাই তিনি বলেন —

> দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। ক্লাইভ তৈরী হচ্ছে রক্ত শুষে নেবার জন্যে। এ দেশের ধনদৌলত পাঠাতে চান বিলেতে। নবাব প্রজাদের শোষণ করতে চাইছেন ফুর্তির জন্য। দিল্লীর বাদশা টুকরো কাগজে দস্তখত করবেন শওকত জঙ্গের টাকার বিনিময়ে। সবাই আছে শোষণের মতলবে।[৭]

মীর জাফর আলী খানের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য পলাশী প্রান্তরে অস্তাচলে গেছে। যিনি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করেছেন, যার দরুন বাঙালি জাতি বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশব্দ রূপে 'মীর জাফর' শব্দটি ব্যবহার করেছে — সেই মীর জাফর আলী চরিত্র নির্মাণে সাঈদ আহমদ বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

সাঈদ আহমদের *শেষ নবাব* নাটকে কর্নেল ক্লাইভের চরিত্রটি অনেকখানি গুরুত্বের দাবিদার। নাট্যকার সম্পূর্ণ একটি অঙ্ক জুড়ে ক্লাইভের মনোবিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ক্লাইভ ছিলেন বাবা মা'র অবাধ্য সন্তান। তাই তার বাবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে চাকুরি দিয়ে তাকে ভারতে পাঠিয়ে দেন। ক্লাইভ ছিলেন ধূর্ত ও সাহসী, কৌশলী ও ষড়যন্ত্রকারী। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে রাজ-অমাত্য এবং সেনাপতিদের উৎকোচ ও প্রলোভন দিয়ে নিজ দলে ভিড়িয়েছেন। চন্দননগরের ফরাসি কুঠি দখলের পর তিনি নবাবের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ বাধে। এ যুদ্ধে শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার আপাত জয় হয়। নবাব পক্ষের অধিকাংশ সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, ফলে অতি সহজেই ক্লাইভ জয়লাভ করেন। ক্লাইভের চরিত্রটিকে সাঈদ আহমদ নিপুণতার সাথে সৃষ্টি করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ক্লাইভের নিম্নোক্ত উক্তি —

> যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পেছপা হবার দীক্ষা আমি পাইনি। তাই তোমাদের রাস্তা বাতলাতে পারবো না। ময়দানে যখন পৌঁছেই গেছি তখন মৃত্যু আমার সঙ্গী মুহূর্তের। বুঝতে পারছি দাঁড়ি-পাল্লায় আমাদের ওজন অনেক কম। জানো প্যাট্রিক যুদ্ধের tactics হয় দুটো। হয়

Dhaka University Institutional Repository

> aggresive না হয় defensive। কিন্তু এ রণাঙ্গনে aggressiveও নয় defenciveও নয়। কোন প্রচলিত রীতি, আচার ধর্মের ধার ধারে না। এ যুদ্ধ জটিল ষড়যন্ত্রের যুদ্ধ, এ যুদ্ধ উৎকোচের যুদ্ধ। প্রতারক আর অবাঞ্ছিতের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ অভাগাদের যুদ্ধ।[৮]

অপ্রয়োজনীয় অনেক চরিত্র ছেঁটে বাদ দিয়েছেন সাঈদ আহমদ। তাঁর অগ্রজ নাট্যকার — গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শচীন সেনগুপ্ত এমন কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যাদের অহেতুক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য নাটকে আমরা এমন প্রবণতা লক্ষ করি না। সাঈদ আহমদ মাত্র একটি নারী চরিত্রের অবতারণা করেছেন *শেষ নবাব*-এ। ঘসেটি বেগম তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত জীবন্ত শক্তিশালী চরিত্র, নাটকের মৌল কাহিনীর জন্য অপরিহার্য চরিত্র। সাঈদ আহমদ সহজেই আরো নারী চরিত্রের অবতারণা করতে পারতেন। জনপ্রিয়তা হাসিল করার উদ্দেশ্যে নাটকে জুড়ে দিতে পারতেন নৃত্যগীত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার সংযম প্রশংসনীয়। তা ছাড়া তিনি নাটকটিকে সিরাজের মৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাননি, পলাশীর প্রান্তর থেকে নবাব সিরাজদ্দৌলার পলায়নের পরই নামিয়ে দিয়েছেন যবনিকা।

পলাশীর যুদ্ধের নানা তথ্য পরিবেশন করে সাঈদ আহমদ *শেষ নবাব*-এ নতুন উপাদান যোগ করেছেন। এই দিকটির প্রতি তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ মনোযোগ দেননি। মীরজাফরের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও নবাবের অনুগত ছিল হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত। তবু কেন পরাজয় মেনে নিতে হলো সিরাজদ্দৌলাকে ? মীরজাফরের দোষ অনেক। তবে ঘটনার আরো বিশ্লেষণ প্রয়োজন রয়েছে। সে-দিকেই নাট্যকার সাঈদ আহমদ অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। ওমর বেগ মীর জাফরের অঙ্গীকার সম্পর্কে যে তথ্য তুলে ধরেছেন, তা আমরা প্রথমবারের মতো সাঈদ আহমদ-এর নাটকে পাই। ক্লাইভ চরিত্রের রূপায়ণে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। যে-চরিত্রটি সিরাজদ্দৌলার প্রধান প্রতিপক্ষ, যে চরিত্রটি ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই চরিত্রের এত বেশী গভীরে সাঈদ আহমদের আগে কোন নাট্যকার যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

সংলাপের উপরই একটি নাটক দাঁড়িয়ে থাকে। সংলাপ রচনাতেও সাঈদ আহমদ অন্যান্য নাট্যকারের ধরন পরিহার করে একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গি নির্মাণ করেছেন। কম কথায় অধিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য তিনি সাধন করেছেন এমনই দক্ষতার সঙ্গে যে তারিফ না করে উপায় নেই। কোথাও একটি বাড়তি কথা নেই, পুরোপুরি নির্মেদ এই নাটকের সংলাপ।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

শেষ নবাব নাটকে সাঈদ আহমদ ইতিহাসকে সমকালের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছেন। "সিরাজদ্দৌলার শক্তি আর সাহস আর দেশ প্রেমকে নাট্যকার সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন সমকালীন জনমানবের চিত্তে। ফলে সিরাজদ্দৌলা তাঁর হাতে উপস্থাপিত হয়েছে নতুন পরিচয়ে, নতুন সত্তায়। ইতিহাসের জটিলতা কাটিয়ে সিরাজদ্দৌলাকে তিনি সমুত্থিত বাঙালির রূপক চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন। ইতিহাসের অস্থি-করোটিতে তাই সহসাই প্রতিভাসিত হয় আরেক শ্রেষ্ঠ বাঙালির অবয়ব শেখ মুজিবর রহমান যাঁর নাম। সাঈদ আহমদের হাতে ইতিহাস এভাবেই হয়ে ওঠে সমকাল-স্পর্শী এবং এখানেই *শেষ নবাব* নাটকের কালোত্তীর্ণ সার্থকতা।"[১০]

তথ্যনির্দেশ

১. সাঈদ আহমদ, *শেষ নবাব*, দ্রষ্টব্য — 'পূর্বলেখ'।
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. সাঈদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৫
৬. ঐ, পৃ. ১৪
৭. সাঈদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
৮. ঐ, পৃ. ২৯-৩০
৯. সাঈদ আহমদ, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য — 'পূর্বলেখ'।
১০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, "বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)", রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদক), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক* (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ১৯৯৮), পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৈয়দ শামসুল হক

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৈয়দ শামসুল হক

বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) কবি, কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার হিসেবে সমধিক পরিচিত। তিনি বিবিসি'র বাংলা বিভাগে কর্মরত থাকাকালে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে পড়তে গিয়ে দেখা পান বাংলার এক অসামান্য কৃষক নেতার। এরপর তিনি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে বাংলার কৃষক-বিদ্রোহ বিষয়ে কিছু নথিপত্র, দলিল, পুরোনো বই ঘাঁটাঘাটি করে নূরলদীনকে আবিষ্কার করেন এবং পরবর্তীতে তিনি দেশে ফিরে এসে রচনা করেন *নূরলদীনের সারা জীবন* নাটক (১৯৮২)।

১৭৫৭ সালে পলাশীর রণক্ষেত্রে যুদ্ধের অভিনয় করে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দুটি প্রদেশ — বাংলা ও বিহারের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। বাংলা ও বিহারের শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েই ইংরেজ বণিকরা বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ভেঙে দিতে আরম্ভ করে। প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের কঠিন খোলস ভেঙে কৃষককে মুক্ত করা এবং পণ্য-ব্যবসায় ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের যন্ত্ররূপে তাদের ব্যবহারের জন্য এ-দেশের মানুষকে ইংরেজ বণিকরাজের একচেটিয়া শোষণের বন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

ইংরেজ শক্তি সমগ্র ভারতব্যাপী যে ধ্বংসস্তূপের সৃষ্টি করেছিলো সেই বিরাট ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পরাজিত ও পদদলিত ভারতবাসী, বাংলার কৃষক সম্প্রদায় অসহনীয় শোষণ-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ইংরেজ শাসক ও জমিদার-মহাজনদের বিশাল গোষ্ঠী এক ভয়ংকর রূপ নিয়ে ভারতের অসহায় কৃষকদের পিষে মারতে থাকে। এ-অবস্থায় কৃষকের সামনে খোলা থাকে মাত্র দুটি পথ — সেই বিশাল গোষ্ঠীর চাপে অনিবার্য

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংস, অথবা বিদ্রোহ ও বিপ্লবের দ্বারা তাদের উচ্ছেদ সাধন। ভারতের কৃষকগণ দ্বিতীয়টিকেই একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করেন, পরাধীন ভারতের কালিমালিপ্ত ইতিহাস এবার পরিণত হয় কৃষকের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের রক্তরঞ্জিত ইতিহাসে।

পরাধীন ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল এক কৃষক-বিদ্রোহের নাম 'রংপুর বিদ্রোহ'। ইংরেজ শাসকগণের লুণ্ঠনের অংশীদার এবং গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রিয় সুহৃদ দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ-উৎপীড়নের প্রত্যক্ষ পরিণতি হলো ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের 'রংপুর বিদ্রোহ'। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে সমগ্র উত্তরবঙ্গব্যাপী দেবী সিংহের বিরুদ্ধে কৃষকদের সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে। কৃষকেরা ইংরেজ-অনুচর দেবী সিংহের শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রংপুরের কালেক্টরের নিকট কৃষকদের দাবী সম্বন্ধে লিখিত একটা আবেদনপত্র পেশ করে দাবি পূরণের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কিন্তু কালেক্টর দাবি পূরণের কোন চেষ্টাই গ্রহণ করেননি। এরপর কৃষকগণ সশস্ত্র বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা কালেক্টরকে জানিয়ে দিল যে তারা আর খাজনা দেবে না এবং তার শাসন মেনে নেবে না। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকেরা সমবেতভাবে নূরুলউদ্দিন নামক এক কৃষককে তাদের পরিচালক নির্বাচিত করে তাঁকে 'নবাব' বলে ঘোষণা করল। নুরুলউদ্দিন উত্তরবঙ্গের কৃষকদের এই বিদ্রোহ পরিচালনার ভার গ্রহণ করে দয়াশীল নামে একজন প্রবীণ কৃষককে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন। নূরুলউদ্দিন এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা দেবী সিংহকে কর না দেবার আদেশ জারী করেন এবং বিদ্রোহের ব্যয় সংকুলানের জন্য কৃষকদের উপর 'ডিং খরচা' নামে চাঁদা ধার্য করেন। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে সমগ্র রংপুর পরগনায় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীদের আহ্বানে কুচবিহার ও দিনাজপুরের বহু স্থানের কৃষকরা নবাব নূরুলউদ্দিনের বাহিনীতে যোগদান করে নিজ নিজ অঞ্চলের নায়েব-গোমস্তাদের বিতাড়িত করে।[১]

এদিকে দেবী সিংহ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর গুডল্যাডের শরণাপন্ন হয়। দেবী সিংহের লুটের টাকা গুডল্যাডও পেতেন বলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কালেক্টর গুডল্যাড তার ও ইংরেজ শাসকদের যোগ্য ভৃত্য দেবী সিংহকে কৃষকগণের ক্রোধাগ্নি থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে সিপাহী প্রেরণ করে। এক বিরাট বাহিনী নিয়ে লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড উত্তর দিকে এবং একজন সুবেদার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। কোম্পানীর সৈন্যরা যাকে সামনে পেল তাকেই গুলি করতে লাগল এবং গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। এদের সাথে বিদ্রোহীদের অনেক খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহীরা দেবী সিংহ ও ইংরেজ শাসনের প্রধান ঘাঁটি হাট বন্দরের উপর হামলা করলে সেখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিদ্রোহের নায়ক 'নবাব নূরুলউদ্দিন' গুরুতর আহত হয়ে শত্রুদের হাতে বন্দী হয় এবং তাঁর দেওয়ান দয়াশীল নিহত হয়। নূরুলউদ্দিন সেই আঘাতের ফলেই অল্প কয়েকদিন পর প্রাণ ত্যাগ করেন। যুদ্ধে বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর শুরু হয় ইংরেজ বাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডব।

রংপুর কৃষক-বিদ্রোহের এই কাহিনী অবলম্বনে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছেন *নূরলদীনের সারা জীবন* (১৯৮২)। পুরোনো নথি-পত্রে কৃষক-বিদ্রোহের নেতার নাম পাওয়া যায় নূরুলউদ্দিন। তবে সৈয়দ শামসুল হক রংপুর অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উচ্চারণরীতি অনুসারে এই বীর কৃষকনেতার নাম রেখেছেন নূরলদীন।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরলদীন। আজ থেকে দুশো বছর আগে এক অগ্নি-পুরুষের অভ্যুত্থান ঘটেছিল রংপুরে, গেরিলা নেতা বলতে এখন আমরা যা বুঝি তিনি ছিলেন তাই-ই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের কাছে তিনি ছিলেন 'নবাব'।[২]

নূরলদীনের ডাকেই রংপুরের সাধারণ মানুষ একদিন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই হাতিয়ার তুলে নিয়েছেন রংপুরের নিপীড়িত কৃষকগণ। তারা শাসক-শোষক-লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন নূরলদীনের নেতৃত্বে। নাট্যকার এখানে যে নূরলদীনকে নির্মাণ করেছেন — তিনি অকুতোভয়, নির্ভীক। বাংলার সম্পদ লুট করে ইংরেজ কোম্পানী নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করছে। অপর দিকে সাধারণ কৃষক না খেয়ে মারা যাচ্ছে। অতিরিক্তি খাজনার দায় শোধ করতে গিয়ে কৃষককুল সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

নাটকের অষ্টম দৃশ্যে দেখা যায় নূরলদীনের পিতা রাজার খাজনা শোধ করতে গিয়ে হালের বলদ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। অগত্যা নিজে বলদ হয়ে জোয়াল কাঁধে নিতে হয়েছে তাঁকে। এই দৃশ্যটি নূরলদীনের সংলাপে প্রাণবন্ত রূপে ধরা পড়েছে এভাবে —

> হঠাৎ নূরলদীন দেখিবার পায়,
> দেখিয়া তাজ্জব তাঁই হয়া যায়, দেখিবার পায়,
> বাপ তার নিজ কান্ধে জোয়াল তুলিল,
> জোয়ালে সে অতি ধীরে নিজেকে জুতিল।
> বলিল নূরলদীন, বেচইন, 'এ কি হয়? কোনঠে বলদ?'
> 'বাপ, আজি হতে নাঙলের নূতন বলদ।'
> আবার নূরলদীন কান্দিয়া শুধায়,
> 'বাপজান, তুমি ক্যান? বলদ কোন ঠাঁয়?'

Dhaka University Institutional Repository

'বলদ তো নাই বাপ, বেচিয়া নগদে
রাজার খাজানা শোধ দিনু কোনোমতে।'
অস্থির বলিল বাপ, 'আয়, বেলা হয়া যায় বাপ,
কান্দে না কান্দে না, বাপ।
হাতে নে নাঙল তুই, মুষ্টি ধরি জোরে দিবু চাপ।
জোরে তুই শক্ত করি থাকিবু কষিয়া,
টানি টানি মুঁই যামো জমিন চষিয়া।'
আজিও নূরলদীন পষ্ট সব পষ্ট করি দেখিবার পায়,
মাথার উপরে সূর্য অগ্নি ঢালি যায়,
একখান মরা গাছে স্তব্ধ মারি শকুন তাকায়।
নিচে, নাঙলের লোহার ফলায়
ধীরে ধীরে মাটি ফাড়ি যায়।
থরথর করি কাঁপে মুষ্টি তার, হাত থামি যায়,
বাপ উলটি ধমকায়, 'বজ্জাতের ঝাড়,
আবার থামিলে তোর ভাঙ্গি দেমো ঘাড়।'
আবার নূরলদীন নাঙলের মুষ্ঠি ধরে চাপিয়া ঠাসিয়া,
আবার জোয়াল টানি বাপ যায় জমিন চষিয়া,
জমিন চষিয়া চলে বাপ তার ভাঙ্গিয়া কোমর,
অগ্নি ঢালি যায় সূর্য বেলা দু'পহর।
জোয়াল কান্ধেতে বাপ অকস্মাতে পড়ি যায় জমির উপর।
ঘাড় ভাঙ্গি পড়িয়া সে যন্ত্রণায় ছটফট করে কিছুক্ষণ,
তারপর, হঠাৎ মস্তক তুলি, নিলক্ষার পানে দৃষ্টি করিয়া স্থাপন,
বাপজান, বাপ মোর, ভাগাড়ে অন্তিমকালে পশুর মতন,
ডাক ভাঙ্গি উঠিল হাম্বায়।
মানুষ উঠিল ডাকি পশুর ভাষায়।
স্তব্ধ মারি শকুন তাকায়।
মাথার উপরে সূর্য অগ্নি ঢালি যায়।
নিচে দেখা যায়,
তখন নূরলদীন দেখিবার পায়,
বাপ নয়, বলদ গড়ায়,
পাঁও খিঁচি একবার স্থির হয়া যায়,
স্থির দৃষ্টি দূর নিলক্ষায়,
শকুন ঝাপটি ওঠে দুরন্ত পাখায়,
বড় স্থির বলদ পড়িয়া আছে, মানুষ নোয়ায়।

Dhaka University Institutional Repository

উঠিল চিৎকার করি, একবার, নূরল তখন,
তখন নূরলদীন, শুনিল তখন,
তখন সে শুনিবার পায়,
নিজেরও গলার স্বর বদলিয়া গেছে তার গরুর হাম্বায়।
তখন, তখন তার অন্তরে নামিয়া সূর্য অগ্নি ঢালি যায়।
ঝটাত শকুন পড়ি মাংস খুলি খায়।
কোন কালে, কত না অতীতকালে, সেই একদিন।
একদিন।[৩]

বাংলার এই নির্যাতিত নিপীড়িত জনগণ ব্রিটিশ শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হতে হতে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। এই সর্বহারা কৃষকেরা নূরলদীনের আহ্বানে সমবেত হয়েছে। নূরলদীনের দলে যোগদান করার জন্য দিনাজপুর, কুচবিহার থেকেও বিদ্রোহীরা এসে হাজির হয়েছে। তাদের কাছে নূরলদীনের উপাধি 'নবাব'।

কিন্তু নূরলদীন নবাব হতে চায়নি, সে পুনরুদ্ধার করতে চায় বাংলার মাটি ও মানুষের অধিকার। নূরলদীনের মুখে উচ্চারিত হয় —

দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
সবার অন্তরে মোর অন্তরের অগ্নি জ্বলিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
সবার অগ্নিতে সব সিংহাসনে অগ্নি ধরিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
মানুষ মানুষ বলি মানুষের কাছে আসিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
আবার নদীর পানি খলখল করি উঠিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
আবার বাংলার বুকে জোয়ারের পলি পড়িতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
আবার নাঙল ঠেলি মাঠে চাষী বীজ বুনিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
নবান্নের পিঠার সুঘ্রাণে দ্যাশ ভরি উঠিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার গাভীন গাই অবিরাম দুধ ঢালিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
মানুষ নির্ভয় হাতে আঙিনায় ঘর তুলিতেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
নিশীথে কোমল স্বপ্ন মানুষের চোখে নামিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
শতশত শিমুলের ডালে লাল ফুল ধরিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার পুত্রের হাতে ভবিষ্যত আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার কন্যার চোখে সুস্বপন আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার ভাইয়ের মুখে ভাই ডাক আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার ভগ্নির ঘর নিরাপদ আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
ঘরে ঘরে মোর ভাই আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
ঘরে ঘরে মোর ভগ্নি আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
পুত্র আছে, আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
কন্যা আছে, আছে।
সুখে দুঃখে অন্নপানে সকলেই একসাথে আছে।
সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশে আছে।
সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশে আছে।
সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশে আছে।[৪]

এই কাব্যনাট্যের একটি ইতিহাসনির্ভর চরিত্র দয়াশীল। বিদ্রোহী কৃষকগণ রংপুরের কালেক্টরের নিকট তাঁদের দাবীর কথা জানালেও সে দাবী পূরণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এ-অবস্থায় কৃষকেরা বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে এবং তারা খাজনা দেবে না এবং শাসন মানতে প্রস্তুত নয় — এমন কথা ঘোষণা করে। নূরলদীন উত্তরবঙ্গের কৃষকদের এই বিদ্রোহ সঠিক পথে পরিচালনার জন্য দয়াশীল নামক একজন কৃষককে নিযুক্ত করেন। তিনি এই নাটকের সর্বত্র একজন প্রবীণ ব্যক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ। দয়াশীলের মুখে উচ্চারিত সংলাপ থেকে উপলব্ধি করা যায় তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য —

নবাব নয় নবাব নয় তোমার মতো মানুষ
তাঁই তোমার মতো মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

তাঁই হামার মতো মানুষ
নবাব নয় নূরলদীন
তাঁই সবার মতো মানুষ।[৫]

এই নাটকের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আব্বাস। এটি নাট্যকারের কাল্পনিক চরিত্র। তবে নাট্যঘটনার সঙ্গে আব্বাসের যোগসূত্র নাট্যকার নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। নাটকে সে নূরলদীনের বন্ধু। আব্বাস আলোচ্য নাটকে দার্শনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাই তাঁর মুখে শোনা যায় —

কার দোষ? নাচে যেই জন, কিম্বা তাকে যে নাচায়?
না নাচিলে একজন অন্যজনে ধরিয়া নাচায়।
অস্বীকার হয় যদি, তালাশ করিয়া ফেরে তবে অন্যজন।

যতোখন
পুতুলার মতো কোন মানুষ না পায় ;
একবার নাগাল পাইলে তার, তাকে ধরি নাচায় সবায়।
কিন্তু নাচে যেইজন? নাচে ক্যানে? বেকুব নোয়ায়।
— না লাগে হামার ভালো, কিছু মোর মনেতে না খায়।[৬]

আম্বিয়া চরিত্রটিকে নাট্যকার বঙ্গ রমণীর আদলে তৈরী করেছেন, যে তাঁর স্বামীর সুখ-দুঃখ নিয়ে সব সময় চিন্তিত। আম্বিয়া অতি সাধারণ নারী। দেশের স্বাধীনতা, মুক্তি ইত্যাদি বড়ো ব্যাপারে সে আগ্রহী নয়। স্বামীকে নিয়ে সব সময় সে সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখে, কল্পনাতে সে রচনা করে এই বাসর —

মোর পতিধন জংগোতে যায় ডিমলা শহরে,
মুঁই নারী হে একায় একা নিশীথ পহরে।
কোন কালে সে আসিবে আর বিজয় করিয়া ?
চোখ ফাটিয়া পড়ে পানি টুপুস করিয়া —
ওকি টাপলাস কি টুপলুস করিয়া।

ডিমলাতেহে আছে রাজা গৌরমোহন চৌধুরী,
কিষান কারিগরের গলায় মারিল তাঁই ছুরী,
বাড়ি নিল নারী নিল গস্ত করিয়া।
উয়ার গলা কাটিম এলা ঘচাং করিয়া —
ওকি ঘেচ্চাং কি ঘচ্চং করিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

রাজার বাড়ি শক্ত বাড়ি রাজায় গড়িছে।
কিষান সেনা আশেপাশে গত্তো করিছে।
গত্তো করি আগুন দিল বারুদ ঠাসিয়া,
ধসিয়া পড়ে রাজার বাড়ি হিড়িম করিয়া —
ওকি হিড়িরিম কি হাড়ারাম করিয়া।

কিষান সেনা ডিমলাতেহে নিশান উড়াইছে,
মোর পতিধন আসেন ফিরি জংগ ফুরাইছে।
আসিলেন কি বসিলেন কি উজাল করিয়া,
পাংখা ধরি বাতাস করোঁ ক্যারোৎ করিয়া —
ওকি ক্যারোত কি কোর্যোত করিয়া। ...

সুস্থ হয়া বসেন পতি বসনু বগোলেতে,
হাউস করি কি আনিয়া দিবেন হাতোতে হে ?
হাউস করে বেড়াই বাড়ি ঘুরি ফিরিয়া,
রুপার খাড়ু পাঁয়ে দিয়া ঝমর করিয়া —
ওকি ঝমমর কি ঝুমমুর করিয়া।

জংগ জিতি মোর পতিধন আসিল হে বাড়ি।
সেই খুশিতে পিন্ধিনু হয় আগুনপাটের শাড়ি।
আগুনপাটের শাড়ি কবে দিবেন আনিয়া ?
আশপড়শীর বাড়ি যামো গুমর করিয়া —
ওকি গুমমর কি গুমমার করিয়া।

আলোচ্য নাটকে কালেক্টর গুডল্যাড একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নাট্যকার এই চরিত্রটি ইতিহাসের পাতা থেকে গ্রহণ করেছেন। গুডল্যাড অত্যন্ত চতুর এবং চৌকষ ব্যক্তি। কোম্পানীর প্রতি দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন। নিজের লাভ-ক্ষতির হিসেব তিনি ভালোই বোঝেন। তাই রংপুরের কৃষক-বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি সব ধরনের ব্যবস্থা সম্পর্কে তৈরী থাকার জন্য তার সহকর্মীদের নির্দেশ দেন —

ডিয়ার মরিস, কোম্পানীর রেভেনিউ সুপারভাইজার,
স্বার্থ আছে আমাদেরও। — নির্ধারিত রাজস্ব আদায়।
কোম্পানীর কুঠির ফ্যাকটর,
টমসন, তার কাছে শুনে নিও — এবং বাণিজ্য —
রেশম, আফিম, বস্ত্র, গুড়, সোরা, নীল।
স্বার্থটা উভয় পক্ষে এক হলে, মিত্র হয়ে যায়

Dhaka University Institutional Repository

পরম শত্রুও।
স্বার্থই সে আমাদের লোক।
তাছাড়া, তুমি নিশ্চয় জানো,
অন'বল ওয়ারেন হেস্টিংস, তার বড় প্রিয়পাত্র এই
দেবী সিং — এবং আমারও।
ক্রমে ক্রমে তোমারও সে হবে।
ক্রমে ক্রমে তুমিও দেখতে পাবে
নেটিভের চোখ ও জিহ্বার চেয়ে আমাদের কাছে
বরং আকর্ষণীয়, হাত, তার হাত।
বরং এ লক্ষণীয়, সেই হাত দেয় কি না দেয়,
দেয় যদি কতখানি দেয়,
কতখানি কোম্পানীকে দেয়,
তোমাকে বা দেয় কতখানি।[৮]

মরিস চরিত্রটি নাট্যকারের কল্পনায় নির্মিত একটি চরিত্র। সে রংপুরের রেভেনিউ সুপারভাইজার। সাধারণ ঘরের সন্তান মরিস চাকরি নিয়ে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে এসেছে। এই সব ইংরেজ দেবী সিং-এর কাছ থেকে নানা ধরনের উপঢৌকন পায়। দেবী সিং উপঢৌকনের অর্থ আদায় করে দরিদ্র কৃষকদের উপর অধিক কর ধার্য করে। মরিস এই ভারতবর্ষ থেকে উপার্জিত অর্থ নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে নিশ্চিত জীবনের স্বপ্ন দেখে —

না।
আমিও তো কল্পনায় দেখি, আমি ফিরে গেছি স্বদেশে আবার।
পল্লীতে আমার আছে সুরম্য ভবন।
আকাশে চিমনির ধোঁয়া, সবুজ বিস্তৃত মাঠ,
সোনার পাতের মতো পড়ে আছে রোদ,
হেঁটে যাচ্ছি, আমার বাহুতে পত্নী ভর দিয়ে পাশে।
আমিও তো স্বপ্ন দেখি — শৃগাল শিকার,
দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে বন্দুক বাগিয়ে।
ঘন ঘন শিঙা বাজে অপরাহ্নে কুয়াশায় বৃক্ষের ভেতরে,
আমিও তো শুনি, আমি শুনি।
আমারও তো সাধ হয়, মাঝে মাঝে, রাজধানী যাই,
লন্ডনের ক্লাবে গিয়ে বসি —
সুরা, তাস, অবসর, বংগদেশ স্মৃতিমাত্র, বাটলার বাহিত ডিনার।
আমিও তো চাই, পত্নীর সোহাগ চাই,

Dhaka University Institutional Repository

পুত্রের দু'হাত ভরে দিতে চাই নিশ্চিন্ত জীবন,
প্রাসাদে কন্যার চাই নাচে নিমন্ত্রণ,
হ্যাঁ, চাই, হ্যাঁ,
আমি চাই — কোনোদিন অর্থে ও সম্পদে যদি সম্ভব তা হয়,
আমার এ দেহে নীল রক্ত আমি চাই,
আমিও ব্যারন হতে চাই,
আমি চাই ব্যারনের জীবন যাপন।[৯]

অষ্টাদশ শতকে ভারত থেকে লেখা এক ইংরেজ মহিলার চিঠির ভিত্তিতে নাট্যকার নির্মাণ করেছেন লিসবেথ চরিত্রটি। লিসবেথ একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি নিজ দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতন। ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধনে লিসবেথ-এর মতো সাধারণ নারীদের ভূমিকা খুব বেশী নয়, কিন্তু তাদের ত্যাগকে ছোট করে দেখবারও কোন কারণ নেই। নাট্যকার অত্যন্ত আধুনিক মনন মিশিয়ে এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। লিসবেথ-এর একটি সংলাপ থেকেই তার আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব বোঝা যায় —

তাহলে শুনুন,
মহামান্য কোম্পানীর সম্মানিত কালেকটর বাহাদুর, শুনুন তাহলে।

ঈশ্বরের অনন্ত কৃপায়,
যিশুর দয়ায়,
যেদিন এ ইন্ডিয়ায় আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হবে,
আমি জানি একদিন হবে,
যেদিন এ ইন্ডিয়ায় দিকে দিকে বৃটেনের পতাকা উড়বে,
আমি জানি একদিন উড়বে উড়বে,
যেদিন এ ইন্ডিয়ায় কোম্পানীর মনোগ্রাম স্মৃতিমাত্র হবে,
যেদিন এ ইন্ডিয়ায় আমাদের প্রথম দিবসগুলো স্বপ্ন মনে হবে,
স্বপ্ন বলে মনে হবে কোম্পানীর এই সংঘ, এই যুদ্ধ, কষ্টসাধ্য এই দিনগুলো,
যেদিন এ ইন্ডিয়ায় বৃটেনের রাজদণ্ডধারী রাজপুরুষের কাছে
এই সব রূপকথা বলে মনে হবে,
যেদিন, যেদিন, ইন্ডিয়ায়
মশা, মাছি, জ্বর কিংবা আমাশয় নয়,
স্বাস্থ্য, মেদ আর ত্বক উজ্জ্বল গোলাপি,
গ্রীষ্মে পাখা, সোরাহির জল, শৈলাবাস, শিকার, বিশ্রাম, ল্যান্ডো,
মশালচি-খানসামা-নৌকর-গোলাম-সেবিত এ ইন্ডিয়াকে

Dhaka University Institutional Repository

অদূর যে ভবিষ্যতে, যেদিন যেদিন
ভূতলে স্বর্গ বলে মনে হবে আমাদের,
সেদিন স্বদেশে,
আর্কাইভ, লাইব্রেরী, ইন্ডিয়া হাউসে,
আমি জানি, কোনো গবেষক
কোম্পানীর ডেসপাচ, রিপোর্ট, মেমোস সব পাশে ফেলে রেখে
সন্ধান করবে কিছু ব্যক্তিগত চিঠি, দিনপঞ্জী —
কার ?
সেইসব মহিলার
যারা এই ঈশ্বরবর্জিত দেশে
আর কিছু নয় শুধু ঈশ্বর নির্ভর করে
একদিন এসেছিল পিতামাতা ছেড়ে,
বধূ হয়ে, প্রিয়া হয়ে, এসেছিল একা শ্বেতাংগিনী —
একমাত্র পরিচিতি পুষ্পরূপে কোম্পানীর যুবাদের কুঠিতে, তাঁবুতে।
এই শ্বেতাংগিনী
রাজনীতি কূটনীতি নয়, তারো চেয়ে গুরুতর
কর্তব্য সাধনে রত ছিল এই ইন্ডিয়ায়,
এই সব শ্বেতাংগিনী ইন্ডিয়ায় এসে
কোম্পানীর যুবাদের উদ্ধার করেছে
কটুগন্ধী কৃষ্ণকায়া রমণীর আলিঙ্গন থেকে।
কোম্পানীর মহামান্য কালেকটর, এইসব মহিলা না এলে
প্রবাস স্বদেশ হয়ে যেত আপনার, আপনার মতো শত
কোম্পানীর কর্মচারী প্রবাসীর কাছে।
এরা না থাকলে, এই মহিলারা,
আপনারা কবেই অভ্যস্ত হয়ে যেতেন বেঙ্গলে
সেই জব চার্ণকের মতো
অম্বুরি তামাক আর ব্ল্যাক জেনানায়।
আপনারা ইন্ডিয়ান হয়ে যেতেন কবেই
যদি এই শ্বেতাংগিনী মহিলারা, যদি আমি, আমি
স্বদেশের মাটি ছেড়ে, অজানার হাত ধরে, একদিন জাহাজে না উঠতাম। তাই
ইতিহাস রচয়িতা সেদিন লিখবে,
আমরা, আমরা, ইন্ডিয়ায় প্রবাসিনী শ্বেতাংগিনী
এ আমরাই আসলে,
সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে,

Dhaka University Institutional Repository

আমাদেরই দেহ ও আত্মার পরে নির্মিত এ রাজ্যপাট —
আপনাদের খ্যাতির আড়ালে।
আমরা না এলে ইন্ডিয়ায়
ইংরেজ মোগল হতো,

হুঁকো টেনে, পালকী চড়ে, গোধূলি বর্ণের পুত্র জন্ম দিয়ে দিয়ে
ইন্ডিয়ান হতো, তাই ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার হতো না।
একদিন ইতিহাস আবিষ্কার করবে এ কথা,
ইতিহাস লিখবে এ কথা —
আপনার উদ্বেগ বা সুনীতির অনুমতি ইতিহাস সেদিন নেবে না —
এভাবে সময় নষ্ট না করে বরং
বিদ্রোহ নির্মূল করে ইতিহাস রচনা করুন,
নূরলদীনের বুকে আঘাত হানুন।[১০]

ইতিহাসকে সৈয়দ শামসুল হক আধুনিক জীবনচেতনার সঙ্গে সংলগ্ন করেছেন পরম নিষ্ঠায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় সমালোচকের মন্তব্য — "ইতিহাস-ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাট্যধারায় সৈয়দ শামসুল হক সঞ্চার করেছেন একটি প্রাতিস্বিক মাত্রা। তাঁর নাটকে যেমন নানা কৌণিক রূপায়ণ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের, তেমনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ-বাস্তবতার। স্বাধীনতা-পরবর্তী বিপন্ন সময় থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সৈয়দ শামসুল হক দুশো বছরের পুরোনো ইতিহাস থেকে তুলে এনেছেন রংপুরের বীর কৃষকনেতা নূরলদীনকে। ১৭৮৩ সালের রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কৃষকনেতা নূরলদীনের সংগ্রাম আর সাহস আর সংক্ষোভ নিয়ে গড়ে উঠেছে সৈয়দ শামসুল হকের অবিস্মরণীয় নাটক *নূরলদীনের সারা জীবন*। নূরলদীনের ব্রিটিশ-বিরোধিতার সঙ্গে সৈয়দ শামসুল হক অসামান্য নৈপুণ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের উপনিবেশবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রামকে এবং এখানেই *নূরলদীনের সারা জীবন* নাটকের কালোত্তীর্ণ সিদ্ধি। সৈয়দ শামসুল হক মনে করেন, ১৭৮৩ কী ১৯৫২ কিংবা ১৯৭১ সালে বাঙালির জাগরণ বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। বাঙালি জাতিসত্তার এই সংগ্রামী চেতনা উপস্থাপনের জন্যেই তাঁর নূরলদীন স্মরণ। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত পয়ার ছন্দে বিন্যস্ত ব্যতিক্রমী এই কাব্যনাট্য বাংলা নাটকের ইতিহাসে সঞ্চার করেছে নতুন এক মাত্রা।"[১১]

নূরলদীনের সারা জীবন সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক জিয়া হায়দার যে মত প্রকাশ করেছেন, এখানে তা প্রণিধানযোগ্য —

> In *Nurul Deen*, Syed Haq has taken a bigger canvas dramatizing the past : the peasant revolt in Rangpur in

Dhaka University Institutional Repository

> the sixth decade of the eighteenth century against the British and its defeat. In a sense Nurul Deen is a prelude to *Payer Awaz* though it was written later. Clearly, he wanted to show the continuity of our freedom struggle against colonialism and foreign occupation. He concludes *Nural Deen* on a note of unfaltering promise of a continuous struggle and hope for success.[১২]

আলোচ্য নাটক সম্পর্কে নাট্য-অভিনেতা আলী যাকের-এর অভিমত এখানে উল্লেখ করা যায় — "*নূরলদীনের সারা জীবন* কোন সনাতন সংজ্ঞাবদ্ধ বীরগাঁথা নয়। এই বীরগাঁথার নায়ক তাবৎ বীরগাঁথার নায়কদের মত প্রায় অতিমানবিক কোন বীরশ্রেষ্ঠ নয়। নূরলদীনকে বড় কাছের মানুষ বলে মনে হয়, বড় বেশী চেতনাগ্রাহ্য বলে মনে হয়। আর আর চরিত্রগুলোকেও বড় বেশী চেতনাগ্রাহ্য বলে মনে হয়। ঘটনার পরম্পরা, কী অসাধারণ মুন্সিয়ানা নিয়ে নাট্যকার ইতিহাসের পাতা থেকে বেছে নিয়েছেন একটি বিশেষ সময়, একটি বিশেষ স্থান এবং কিছু চরিত্রকে। তারপর প্রায় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে বিছিয়ে পরীক্ষা করেছেন ঘটনা প্রবাহের, মানুষের মন-মানসিকতার। প্রত্যেকটি চরিত্র তখন তার আচ্ছাদন ছুঁড়ে ফেলে একেবারে অন্তরের কথাটি তুলে ধরেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অস্তিত্বে লালিত স্ববিরোধিতাও, নূরলদীনের সারা জীবন একটি সুগ্রন্থিত নাটক, যাকে মঞ্চায়িত করা যায় 'ওয়েল মেড প্লে' হিসেবে।"[১৩]

নূরলদীনের সারা জীবন নাটক সম্পর্কে সৈয়দ শামসুল হকের অভিমত এখানে প্রণিধানযোগ্য। নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন —

> নিজেকে দেয়া অনেকগুলো কাজের একটি এই যে, আমাদের মাটির নায়কদের নিয়ে নাটকের মাধ্যমে কিছু করা, *নূরলদীনের সারা জীবন* লিখে তার সূত্রপাত করা গেল। যে জাতি অতীত স্মরণ করে না, সে জাতি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না। এই কাব্যনাট্যটি লিখে ফেলবার পর আমার আশা এই যে, এই মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন এমন যেসব গণনায়কদের আমরা ভুলে গিয়েছি তাদের আবার আমরা সমুখে দেখব এবং জানব যে আমাদের গণআন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের ও অনেক বড় মহিমার — সবার ওপরে, উনিশশো একাত্তরের সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমি আমার একটি পূর্ব ধারণার সমর্থন পেয়ে যাই যে, বাংলার সাধারণ মানুষ — কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র উনিশশো একাত্তরেই যে গেরিলা হয়েছে তা নয়, এই গেরিলা হয়ে যাবার একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে। এটা উপলব্ধি করতে না পারলে আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কেবল লঘুই করে যেতে থাকব।

Dhaka University Institutional Repository

> আমি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করি যে, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবার আগে সতেরোশো বিরাশিতে নূরলদীন যেমন ইংরেজ শাসকদের কাছে প্রতিকার চেয়ে দরখাস্ত করেছিলেন ; একাত্তরের শেখ মুজিবর রহমানও তেমনি পাকিস্তানী সামরিক শাসকের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন।[১৪]

সৈয়দ শামসুল হক অসামান্য দক্ষতায় ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কৃষক-নেতা নূরলদীনকে নির্মাণ করেছেন। এই প্রতিবাদী নেতা নূরলদীন যেন ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে একাত্ম হয়ে যান। এখানেই সৈয়দ শামসুল হকের *নূরলদীনের সারা জীবন* নাটকের কালোত্তীর্ণ সার্থকতা।

তথ্যনির্দেশ

১. স্মরণিকা — নাগরিকের ষষ্ঠদশ প্রযোজনা : সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক *নূরলদীনের সারা জীবন*-এ প্রকাশিত — 'রংপুরের বিদ্রোহ -১৭৮৩', সুপ্রকাশ রায়। পৃ. নং উল্লেখ নেই।

২. ঐ, নাট্যকারের কথা, সৈয়দ শামসুল হক, পৃ. নং উল্লেখ নেই।

৩. সৈয়দ শামসুল হক, *নূরলদীনের সারা জীবন*, (ঢাকা : সব্যসাচী, ১৯৮২), পৃ. ৫৯-৬০

৪. ঐ, পৃ. ৮৭-৮৮

৫. ঐ, পৃ. ৮৪

৬. ঐ, পৃ. ২৪-২৫

৭. ঐ, পৃ. ৭৪-৭৫

৮. ঐ, পৃ. ৩১-৩২

৯. ঐ, পৃ. ৩৪-৩৫

১০. ঐ, পৃ. ৮১-৮২

১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, "বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)", রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদক), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক*, (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ১৯৯৮), পৃ. ২০৭

১২. Zia Hyder, "Contemporary Theatre of Bangladesh" in *Contemporary Bengali Writing* (Editor : Khan Sarwar Murshid), Dhaka : University Press Ltd, 1996, p. 287

Dhaka University Institutional Repository

১৩. স্মরণিকা — নাগরিকের ষষ্ঠদশ প্রযোজনা : সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক *নূরলদীনের সারা জীবন*-এ প্রকাশিত 'নির্দেশকের কথা' শিরোনামে অভিনেতা আলী যাকের। পৃ. নং উল্লেখ নেই।

১৪. পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য — 'ফের কথা'।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মামুনুর রশীদ

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মামুনুর রশীদ

বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের একটি উল্লেখযোগ্য নাম মামুনুর রশীদ (জ. ১৯৪৮)। তিনি একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা এবং নির্দেশক। মামুনুর রশীদ শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত গণমানুষের মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন নাটককে। তাঁর নাটকের আদর্শ ও উদ্দেশ্য জীবনের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। *ওরা কদম আলী* (১৯৭৮), *ওরা আছে বলেই* (১৯৮০), *ইবলিশ* (১৯৮২), *এখানে নোঙর* (১৯৮৪), *গিনিপিগ* (১৯৮৫), *পাথর* (১৯৯৩) প্রভৃতি নাটকে আমরা পাই একজন মানববাদী সংগ্রামী শিল্পীকে। মামুনুর রশীদের ইতিহাস-আশ্রিত গুরুত্বপূর্ণ একটি নাটকের নাম *লেবেদেফ* (১৯৯৭)।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের কালে ইংরেজরা নিজেদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য কলকাতায় রঙ্গালয় স্থাপন করেছিল। সেখানে অভিনীত হতো ইংরেজি নাটক — অভিনয় করত ইংরেজরাই। বাঙালির সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ইংরেজদের অনুকরণে রঙ্গালয় স্থাপন করে বাংলাভাষায় নাটক মঞ্চায়নে যিনি প্রথম এগিয়ে আসেন তিনি একজন রুশদেশীয় পর্যটক। তাঁর নাম গেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেদেফ।

আজ থেকে দু'শ বছর আগে ১৭৯৫ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার ২৫ নম্বর ডুমটোলা রঙ্গমঞ্চে ঘটেছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজি থিয়েটারের বিপরীতে মঞ্চায়িত হয়েছিল বাংলা ভাষার নাটক। সেদিন বাঙালি দর্শকদের জন্য *The Disguise* এবং *Love is the Best Doctor*-এর অনুবাদ-নাট্যদ্বয় অভিনয়ের জন্য যে ব্যক্তি মূল ভূমিকা পালন করেন তিনি গেরাসিম লেবেদেফ। সঙ্গীত-শিল্পী ও গবেষক লেবেদেফ সেদিন নাট্যশালায় যে শিখাটি প্রজ্জ্বলিত করেন, ধারাবাহিকতা ব্যাহত হলেও পরবর্তীকালে তা-ই বাংলা মঞ্চ-নাটকের মূল ধারায় পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেদেফ এদেশে আসবার আগেও আমাদের নাট্য-ঐতিহ্য ছিলো — ছিলো যাত্রা, পালা, কবিগান, গম্ভীরা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি। কিন্তু তা ছিল কখনো অশ্লীল কদাচার, কখনো পৌরাণিক ও ধর্মীয় ভাবালুতায় পরিপূর্ণ। তার বিপরীতে কোম্পানীর ইংরেজি থিয়েটারে কিছু রাজা, মহারাজা, বেনিয়া-গোমস্তার প্রবেশাধিকার থাকলেও তথাকথিত নেটিভ ইন্ডিয়ানদের প্রবেশাধিকার সেখানে ছিলো না। তাই গেরাসিম লেবেদেফের বাংলা নাটকের মঞ্চায়ন ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। আর তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোপানলে পড়ে নানাভাবে অপমানিত, পর্যুদস্ত ও কপর্দকহীন নিঃস্ব অবস্থায় লেবেদেফকে ফিরে যেতে হয় তাঁর স্বদেশে। সেদিন তিনি যে প্রচণ্ড ভালোবাসায় বাংলা নাটক মঞ্চায়নের দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, তা আজো বাংলা ভাষাভাষী নাট্যকর্মীদের অনুপ্রাণিত করে।[১]

লেবেদেফকে কেন্দ্র করে তর্ক-বিতর্কের অনাবশ্যক ঘোরটা কেটে যায় নাট্যকার-নির্দেশক মামুনুর রশীদের *লেবেদেফ* নাটকের মাধ্যমে। আলোচ্য নাটকে মামুনুর রশীদ লেবেদেফের জীবন নিয়ে কোন ইতিহাস নির্মাণ করতে চাননি — চাননি গবেষণা করতেও। তাই নাটকটির মঞ্চায়ন দেখতে গেলে বা এর কোন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে পড়লে ইতিহাসের বিতর্ক এড়িয়ে লেবেদেফ এক ভিন্ন মানুষ হয়েই সকলের হৃদয়ে স্থান করে নেন। তাঁর অমায়িক ব্যক্তিত্ব সকল কিছুকে ছাপিয়ে তাঁকে পরিণত করে এক বিশ্বস্ত নেতায় ; যে নেতার ওপর আস্থা রেখে এগিয়ে যেতে পারে একটি নাটকের দল, যার ওপর নির্ভর করতে পারে একটি সমাজ অথবা সমাজের অবহেলিত মানুষ। যে কারণে ইংরেজ বেনিয়ার সাজানো আদালতের কাছে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে লেবেদেফ যখন মঞ্চ ত্যাগ করেন, তখন ন্যায় বিচার প্রত্যাশী সকল মানুষ মুষড়ে পড়লেও এই ভেবে তিনি স্বস্তি পান যে, ভণ্ড প্রতারক ইংরেজদের কাছে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেননি। মূলত *লেবেদেফ* নাটকে রুশ-পর্যটক গেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেদেফ যখন মাদ্রাজ থেকে জাহাজে চড়ে কলকাতা এসে পৌছান তখন পাঠক-দর্শক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁকে গ্রহণ করেন। কিন্তু নাটক যত এগোয় তত তিনি পাঠক-দর্শক-হৃদয়ে জায়গা করে নিতে থাকেন। স্ব-হৃদয়ে তাঁর জন্য জায়গা করে দেবার ব্যাপারটি পাঠক-দর্শক কেবলমাত্র ঘটনার ঘোরের মধ্যে থেকে আবেগতাড়িতভাবে করে ফেলেন, তা কিন্তু মনে হয় না। যুক্তির গ্রাহ্যতাও এক্ষেত্রে কাজ করে। বিদেশী হলেও ধূর্ত ইংরেজ আর তথাকথিত অগ্রসর জগন্নাথ গাঙ্গুলীর মত বাঙালির চেয়ে লেবেদেফকে অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেই মনে হয় পাঠক-দর্শকদের কাছে। তাইতো কয়েকটি পোড়া পাণ্ডুলিপি নিয়ে লেবেদেফ যখন শেষবারের মত মঞ্চ ত্যাগ করেন তখন পাঠক-দর্শকদের সহানুভূতি চারপাশ থেকেই তাকে অনুসরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তার মঞ্চ ত্যাগ বা কলকাতা ত্যাগের সময়েই নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সময়ের কলকাতা — যখন চারদিকে আকাল-পীড়িত মানুষের হাহাকার, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষাপ্রার্থীর স্রোত, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের বিলাসী জীবনযাপন, আখড়াই, হাফ-আখড়াই নামে বিকৃত কুরুচিপূর্ণ সংগীতচর্চার জোয়ার, বাবু কালচার আর ইংরেজদের নানামুখী জটিল-কুটিল চক্রান্ত, তখন লেবেদেফ-এর কলকাতা আগমনকেও অত্যন্ত সময়োচিত এবং প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। এই প্রাসঙ্গিকতাকে আরো দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয় ইংরেজ শাসকরাই। একদা বন্ধুর মত স্বাগত জানানো সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শত্রুর মত বিতাড়িত করে তারা প্রমাণ করে দেয় লেবেদেফ ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করতে আসেননি, এসেছেন নেটিভদের স্বার্থ রক্ষা করতে। নেটিভদেরও একথা বুঝতে বাকি থাকে না। তাই বেঙ্গলী থিয়েটার বন্ধ হবার কথা শুনে তরুবালার চোখে জল নামে, লেবেদেফ দেউলিয়া হয়ে গেছেন জানতে পেরে রবিদাস আর পণ্ডিত গোলকনাথ দাস দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তাদের সকলের কাছে ভাষা সংস্কৃতি আর ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে মানুষ লেবেদেফ অনেক বড় হয়ে ধরা দেন।[২]

নাট্যকার মামুনুর রশীদ *লেবেদেফ* নাটকটি ইতিহাস ঘেটে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে এটি নিরেট ইতিহাস নয়, নয় এটি কোন গবেষণাকর্মও। নাটকটির সর্বত্র লেবেদেফের পদচারণা মামুনুর রশীদ এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে তা পাঠক-দর্শক হৃদয়ে দাগ না কেটে পারেনি।

প্রথম যখন লেবেদেফ কলকাতা বন্দরে এসে পৌছান, তারপর থেকে নাট্যকার একের পর এক চরিত্রের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা পাই আলেকজান্ডার কীড, মিসেস কীড, রোওয়ার্থ, জোসেফ ব্যাটল, পণ্ডিত গোলকনাথ দাস, রবিদাস, জগন্নাথ গাঙ্গুলী, সুখময়ী, তরুবালা, সূর্য — এইসব চরিত্রের সাক্ষাৎ।

আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র লেবেদেফ। "লেবেদেফ এক রুশ সন্তান। আকস্মিকভাবে এক সময়ে তিনি সেকালের সুদূর ও স্বল্পজ্ঞাত কলকাতা শহরে আসেন। এই গুণী নাট্যরসিক ব্রিটিশ রাজত্বের শুরুতেই ১৭৯৫ সনে বিদেশী, বিজাতি, বিধর্মী, বিভাষী, কালো বাঙালিকে ভালোবেসে ফেলেন। তাঁর উদার মানববাদিতার সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে এই ভালোবাসা। য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালিদের পরিচয় ঘটানোর যে দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ শাসকদের, তিনি স্বেচ্ছায় অভিনয়ে দীক্ষা ও শিক্ষা দানের সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দুশো বছর আগে কলকাতার শিক্ষিত সংস্কৃতিমনা বাঙালিকে প্রতীচ্য সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয়ার কৃতিত্বের ও কৃতজ্ঞতার দাবিদার হচ্ছেন লেবেদেফ। মামুনুর রশীদের কৃতিত্ব হচ্ছে প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রথম পরিচায়কের

Dhaka University Institutional Repository

জীবন, কর্ম, অবদান সম্বন্ধে সৃষ্টিশীল সাহিত্য তথা নাটক রচনা করে গোটা বাঙালি জাতির পক্ষে লেবেদেফের কাছে আমাদের ঋণের স্বীকৃতি দিয়ে বাঙালিকে এতোকালের ঔদাসীন্যের লজ্জামুক্ত করলেন।"[৩]

মামুনুর রশীদ দক্ষ নাট্যকার রূপে ২০০ বছর আগেকার প্রতিকূল প্রতিবেশের পটে লেবেদেফের ভূমিকা বিশেষ নৈপুণ্যের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। বাংলা ভাষায় রচিত দুই বঙ্গে লেবেদেফের উপর তথ্যঋদ্ধ দুটো জীবনী-গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও মামুনুর রশীদের এই নাটকে আমরা লেবেদেফকে একজন প্রাণবন্ত আত্মপ্রত্যয়ী সংগ্রামী পুরুষ হিসেবে প্রত্যক্ষ করি এবং তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করি। ইংরেজ কোম্পানীর লোকদের সরব ও সক্রিয় বিরোধিতার দরুন তৈরি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁকে কলকাতা ছাড়তে হয়।[৩]

নাট্যকার মামুনুর রশীদ লেবেদেফের চরিত্র যতটা সম্ভব মানবীয় করে তুলেছেন। লেবেদেফ ভালোবেসেছেন ভারতবর্ষকে, ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে। তাই তিনি বলেন —

> হ্যাঁ, ক্যালকাটা থিয়েটার। সেখানে আমি নাটকও দেখেছি। কিন্তু এতবড় একটা দেশ ভারতবর্ষ, তার ভাষা এত সমৃদ্ধ — অথচ নাট্যমঞ্চে তাদের নিজস্ব নাটক নেই। ইউরোপের সর্বত্র নাট্যমঞ্চের স্থাপত্যগুলোও তো দেখবার বিষয় — নাট্যশালা ছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব আছে?[৪]

লেবেদেফ অনেক আশা নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভালবেসে তিনি নাটক মঞ্চায়নে ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতি তাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে —

> দেখুন আমি ক্লান্ত — অবসন্ন — হয়তো এ সময়ে কোনো ব্যাধিও আমাকে আক্রমণ করে ফেলতে পারে। জানি না তাতে কি হবে আমার পরিণতি — আপনারা বরং নিয়ে যান — আমার যা কিছু আছে — তবে আপনারা যাই ভাবুন না কেন — আমি অবনত হব না আপনাদের মতো ভণ্ড প্রতারক ব্রিটিশদের কাছে। বিচার-বিবেচনাহীন এই সেটেলমেন্ট (কাঁপছিল থর থর করে) আমারই অতি পরিচিত গুণমুগ্ধ গভর্নর, বিচারক, টাউনমেজর — একদিন আমার ভায়োলিন চেলো শুনে, আমার নাটক দেখে, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে, আজ কোন অজ্ঞাত কারণে তারা আমাকে চিনতে পারে না — আমি তো প্রতিদ্বন্দ্বী নই কারো — আপনারা আর কি চান? চলে যান — আমাকে বিশ্রাম নিতে দিন —[৫]

লেবেদেফের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক হায়াৎ মামুদের অভিমত এখানে স্মরণীয় — "এদেশে এসে লেবেদেফ দেখতে পেয়েছিলেন যে ভারতীয় জনগণ স্বভাবে অলস ও ধর্মভীরু, অতিপ্রাকৃততে বিশ্বাসী ও পুরোহিত-সমর্পিতপ্রাণ। রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মতো এরাও এক অচলায়তনের মধ্যে বসবাস করে। শক্তি ও শক্তের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

ভয়ে বা ভক্তিতে শুধু আনত হতেই জানে, বিদ্রোহে রুখে দাঁড়াতে শেখেনি, ইহজগতের চেয়ে পরলোক ভারতবাসীর নিকট অধিক মূল্যবান। রুশ-মানসিকতায় গির্জা, মঠ ও তীর্থস্থানে অচলা ভক্তি অবিকল ভারতবর্ষীয়দের দেব-দ্বিজে ভক্তির সমতুল্য এবং পুণ্যার্জনের সর্বোত্তম পন্থা বলে বিবেচিত। এদেশের জনগণ রুশীয়দের মতই সরল, অনাড়ম্বর, অসহায় ও অদৃষ্টবাদী। লেবেদেফ যে সচেতনভাবে এসব পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন তা বলা যাবে না। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই সাদৃশ্যের রূপ তাঁর দৈশিক স্থিতির পাশাপাশি অবচেতনে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে। বুদ্ধি বা বিচারশক্তির প্রয়োগে সাদৃশ্য অন্বেষণ নয় বা প্রতিতুলনার মালমশলা খুঁজে পাওয়া নয় — তিনি তাঁর বোধের মধ্যে অনুভব করেছিলেন রুশ-মানসের প্রতিবিম্ব এবং ভারতীয়-মানস। মেধাগত নয়, বোধগত অনুভববেদ্যতায় মুদ্রিত এই সাদৃশ্য ছবিই তাঁকে অত্যন্ত গভীরে ভারতমুখী করে তুলেছিল। 'স্লাভ' মানসের সন্তান হওয়ায় এদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের স্বাভাবিক 'পশ্চিমী' প্রবণতা তাঁর মনোজগতে প্রকৃতিগতভাবেই অনুপস্থিত ছিল, একথাও মনে রাখতে হবে। ভারতীয় ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের ঐতিহ্যগত স্মৃতিপরম্পরা পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি বা ইংরেজদের মনে যে Superiority Complex তৈরী করেছিল, এই রুশ আগন্তুক তা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর সমকালীন ইংরেজদের সুদূরপ্রসারী ভারতচর্চা যেখানে কূটনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তারের সহযোগী বুদ্ধিবৃত্তিগত অনুসন্ধান (ইন্টেলেক্চুয়াল কোয়েস্ট), সেখানে গেরাসিম্ স্তেপানভিচ লেবেদেফের ভারতানুসন্ধান সে-অর্থে উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ, একান্তই ব্যক্তিগত, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত।"[৬]

আলোচ্য নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পণ্ডিত গোলকনাথ দাস। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত। লেবেদেফ তাঁর কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। গোলকনাথ দাস সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেছেন রুশ-পর্যটক লেবেদেফকে সাহায্য করতে। তিনি নিজ দেশ ও মাতৃভাষাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। তাই মিসেস আলেকজান্ডার কীড যখন ভারতবাসী সম্পর্কে কটূক্তি করেন, গোলকনাথ দাস তখন প্রতিবাদ করে বলেন —

> এভাবে ঢালাও মন্তব্য করা ঠিক নয় — আপনাদের আশেপাশে এই কোলকাতা শহরে হয়তো তা স্বাভাবিক। কারণ ভালো লোকেরা তো আপনাদের চারপাশ মাড়ায় না। পলাশীর যুদ্ধেই তা চুকেবুকে গেছে। এই শহরের বাইরেও মানুষ আছে, পণ্ডিত আছে, শিক্ষা আছে।[৭]

এই নাটকের মহিলা চরিত্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো তরুবালা চরিত্রটি। তরুবালা পতিতা নারী। অবশ্য সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ভদ্রঘরের মেয়েদের নাটকের চরিত্র

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিলো না। তরুবালা পতিতা হয়েও ভিতরে ভিতরে একটি শিল্পীমনকে লালন করেছে। সে নাটককে ভালোবেসেছে, থিয়েটারকে ভালোবেসেছে। যখন সে শুনেছে থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়েছে। এই অনুভূতি নিতান্তই একজন শিল্পীর। তরুবালার মুখে তাই শোনা যায় —

> আমি যে থেটারের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি — মল্লিক, মিত্তির, বণিকদের ফিরিয়ে দিয়েছি। সুখময়ী যা পারেনি।[৮]

এই নাটকে আরেকটি মহিলা চরিত্র মিসেস আলেকজান্ডার কীড। নাট্যকার মামুনুর রশীদ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই বিদেশী মহিলার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধিমত্তায়, সাহসিকতায় ও প্রজ্ঞায় এই বিদেশী মহিলারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি তৈরীতে সাহায্য করেছে। নিজ দেশ ও জাতি সম্পর্কে এরা খুবই সচেতন। তাই ফরাসি নাট্যকার মঁলিয়ের-এর নাটক মঞ্চস্থ হবে শুনে সে মন্তব্য করে —

> মদ কিছুক্ষণের উত্তেজনা কিন্তু নাটক, সে তো দীর্ঘ সময় থাকে মাথায় — শুধু একজনের নয় হাজার জনের। তারপর আবার সাগর পাহাড় মানে না। ব্রিটিশের রাজত্বে ঘাপটি মেরে চলে এসেছে — যুদ্ধ করতে হয়নি।[৯]

টাউনমেজর আলেকজান্ডার কীডের চরিত্রটি যেন সমস্ত ব্রিটিশ শাসকের প্রতিনিধিত্ব করছে। নাট্যকার দক্ষতার সাথে এই চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। এই ইংরেজরা আমাদের দেশে এসেছিলো বাণিজ্য করতে। ক্রমে এদেশের কিছু স্বার্থলোভী বিশ্বাসঘাতকদের হাত করে দেশের শাসনভার তারা নিয়ে নিয়েছে। ভারতবাসীরা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে ইংরেজদের অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই ভারতবাসী সম্পর্কে আলেকজান্ডারের ধারণা —

> এই আরেক সমস্যা এদের নিয়ে, যখন কাউকে প্রশংসা করে একেবারে তাকে সবার উপরে নিয়ে যায়। আর যখন কাউকে বদনাম করে তখন কোথায় যে নামিয়ে ফেলে সে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। যাকগে আমিও দেখব — তবে আমাদের সমস্যা কি জানেন, আমরা শাসক তো — আমাদের চারপাশে খুব একটা ভালো লোকজন কখনোই আসে না। পণ্ডিতরা তো নয়ই। সব শেঠ, বেনিয়া আর মোসাহেবের দল। জানেন তো পলাশীর যুদ্ধ হলো এই সেদিন — যুদ্ধে খুব একটা লড়তে হয়নি। এই যারা মন্ত্রী রাজন্য, এরা সব বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের সাথে হাত মিলিয়ে ফেলে। ওদের কেউ কেউ এখনো কোলকাতায় আমাদের আশ্রয়ে।[১০]

এক প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াইয়ে বিপর্যস্ত হয়ে লেবেদেফকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হয়েছিলো। সেদিন লেবেদেফ ছিলেন বিদেশী, তাকে লড়তে হয়েছিলো আরেক

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশীর সাথে। কিন্তু আমাদের আজকের লেবেদেফদের লড়তে হচ্ছে দেশী-বিদেশী অনেকের সাথে। খোলা বাজার অর্থনীতির এই যুগে নাট্যকর্মীদের এই লড়াইটা যে কত বহুমুখী তা নাট্যকর্মী মাত্রেই অবগত। লেবেদেফের সময়ে নাট্যশালার যে অবস্থা ছিলো তার বিস্তার না হলেও আজ লড়াইয়ের ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটেছে।

একথা সত্য আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে লেবেদেফ কলকাতা ত্যাগ করেছেন। কিন্তু সেন্ট পিটার্সবার্গ ফিরে গিয়ে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ব-ভারতের তথা বঙ্গদেশের সেতুবন্ধনের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। বাংলা নাটক মঞ্চায়ন করতে গিয়ে এখানকার সংস্কৃতির মধ্যে তিনি কী খুঁজে পেয়েছিলেন যে, এক নিঃসঙ্গ পথিক হিসেবে তিনি এই পথচলায় ক্লান্ত হননি ? দেশে ফিরে গিয়ে ছাপাখানার নির্মাণ ও বাংলা মুদ্রণাক্ষর তৈরী, গ্রন্থ প্রকাশনার মধ্য দিয়ে রুশ-বাংলা তথা বৃহত্তর অর্থে প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একি একজন ভাগ্যান্বেষীর চরিত্র, বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করে অর্থোপার্জন যাঁর লক্ষ্য ? তিনি যেমন বঙ্গদেশবাসীকে নাটকের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন, তেমনি রুশবাসীকে বঙ্গদেশ সম্পর্কে উৎসাহী ও কৌতূহলী করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং রুশ-বাংলা মৈত্রীর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।[১১] *লেবেদেফ* সম্পর্কে নাট্যকার মামুনুর রশীদের মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় —

> অনেক অধ্যাপক, নাট্য-বিশেষজ্ঞ তার অবদান নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। সেসব প্রশ্ন ও বিতর্কের উর্ধ্বে আমি একজন অনুসন্ধানী, আশাবাদী পর্যটক ও দুঃসাহসী অভিযানের জন্য প্রস্তুত একজন মানুষকে পেয়েছি, যিনি বিজয়ী হয়েছেন, পরাজিত হয়েছেন কিন্তু ধ্বংস হননি।
>
> আমি ইতিহাস লিখতে বসিনি। নাটক লিখতে গিয়ে তাঁর জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি মাত্র। তাই গেরাসিম লেবেদেফের নাট্যপ্রয়াস আর তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা ও সংগ্রাম সমানভাবেই বিবেচিত হয়েছে আমার কাছে। তাই দুশো বছর আগের একটি নাট্যঘটনা আজকেও অর্থবহ হয়ে উঠল শুধু কি দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ? — না, ঘটনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনেই। গেরাসিম লেবেদেফের স্মরণে শুধু তাই নয় ; একটা সন্ধিক্ষণ, একটা মানবপ্রেমকে আমাকে বহুদিন ধরেই নাড়া দিচ্ছিল।[১২]

সর্বোপরি, একথা অবশ্যই স্বীকার্য, *লেবেদেফ* নাটকটি বাংলা নাটকের ইতিহাসকে বহন করে। লেবেদেফের সাহসী পদক্ষেপের জন্য আমাদের বাংলা নাটক অনেক পথ পরিক্রম করে আজকের রূপ ধারণ করেছে। এই বিদেশীর কাছে বাঙালি জাতি বিশেষ করে নাট্যপ্রেমী বাঙালি জাতি চিরঋণী হয়ে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. 'নাটক : লেবেদেফ' শিরোনামে বাংলা নাটকের দ্বিশত বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা (সম্পাদক — শিরীন বকুল, প্রকাশক : বাঙলা থিয়েটার, ৪৭/এ ইন্দিরা রোড, ১৯৯৭), পৃ. ৩৩

২. মলয় ভৌমিক, "লেবেদেফ প্রসঙ্গে", *লেবেদেফ* শিরোনামে বাংলা নাটকের দ্বিশত বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮-২৯

৩. মামুনুর রশীদ, *লেবেদেফ*, আহমদ শরীফ-এর শিরোনামহীন ভূমিকা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৭

৪. লেবেদেফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৫. ঐ, পৃ. ৭১-৭২

৬. হায়াৎ মামুদ, "লেবেদেফের মানস-ভূগোল", *লেবেদেফ* শিরোনামে বাংলা নাটকের দ্বিশত বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮-৯

৭. *লেবেদেফ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৮. ঐ, পৃ. ৬৬

৯. ঐ, পৃ. ২৮

১০. ঐ, পৃ. ২০-২১

১১. সন্তোষ গুপ্ত, "লিয়েবেদেফ : ভারততত্ত্ববিদ না ভাগ্যান্বেষী", *লেবেদেফ* শিরোনামে বাংলা নাটকের দ্বিশত বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

১২. মামুনুর রশীদ, *লেবেদেফ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ধারায় ঐতিহাসিক নাটক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বাংলাদেশের প্রধান নাট্যকারের অনেকেই ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। এ-ধারায় যাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হচ্ছেন সিকান্দার আবু জাফর, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, সাঈদ আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক এবং মামুনুর রশীদ। এই সব নাট্যকারের সম্মিলিত সাধনায় সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাট্যধারা।

সিকান্দার আবু জাফর বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার ট্রাজিক ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলার করুণ ইতিহাসকে তিনি সমকালীন জীবনচেতনার সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে বিমণ্ডিত করে তুলেছেন। মুনীর চৌধুরী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে লেখা মুনীর চৌধুরীর *রক্তাক্ত প্রান্তর* নাটকে চিত্রিত হয়েছে এ-কালের যুদ্ধবিরোধী চেতনা। আসকার ইবনে শাইখ তাঁর ত্রয়ী ঐতিহাসিক নাটকে বাঙালির সংগ্রামী ঐতিহ্যের শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন। তাঁর নাটকের মধ্যেও ইতিহাসের সঙ্গে সমকালীন চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। সাঈদ আহমদ তাঁর *শেষ নবাব* নাটকে নবাব সিরাজদ্দৌলার ট্র্যাজিক পরিণতিকে করে তুলেছেন সমকালস্পর্শী। সৈয়দ শামসুল হক ১৭৮৩ সালের রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহের আলোয় বাঙালির সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা চিত্রিত করেছেন। দুশো বছরের পুরোনো কৃষক-বিদ্রোহ আর ১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কাছে একই লক্ষ্যের দুই ভিন্ন প্রকাশ বলে মনে হয়েছে। মামুনুর রশীদ তাঁর নাটকে বাংলা নাটকের অতীত এক প্রান্তকে পাঠক-দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর *লেবেদেফ* নাটক বাংলা নাটকের উৎস-সন্ধানে এক স্মরণীয় সংযোজন।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাট্যকারদের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল মানবতাবাদী ধারাটির সঙ্গে নিজেদের সৃষ্টিকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের যে-সব নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই জীবনের সদর্থক ইতিবাচক কল্যাণকর মানবতাবাদী চিন্তা প্রকাশে

Dhaka University Institutional Repository

অকুণ্ঠ। প্রগতিশীল সমাজচেতনাও এঁদের সহজাত লক্ষণ। ফলে ইতিহাসের ধূসর প্রান্তর থেকে তাঁরা সে-সব উপাদানই সংগ্রহ করেছেন, যেগুলো প্রকাশ করতে পারে তাঁদের প্রগতিশীল মানবকল্যাণকামী মানসপ্রবণতা। এ-কারণে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সর্বব্যাপ্ত হতাশার সময় বাংলাদেশের সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যেখানে হতাশা আর ব্যর্থতার কথামালা, বাংলাদেশের নাটক তখন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

ইতিহাসের বিশাল ডানায় ভর করে বিপর্যয়কে অতিক্রম করতে চেয়েছেন বলে আমাদের নাট্যকাররা খণ্ড-মানসিকতার শিকার হন নি। এ-কারণে বাংলা ঐতিহাসিক নাটক যেখানে হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তা অথবা মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রমশ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেখানে আমাদের নাট্যকাররা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে প্রকাশ করেছেন সর্বমানবিক এক কল্যাণকামী দর্শন। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় বাংলাদেশের নাট্যকারদের এ-এক মৌলিক অবদান। পরবর্তী প্রজন্মের নাট্যকারদের মানসগঠনে এই মানবিক চেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই দৃষ্টিকোণে বিচার করলে, আলোচিত ঐতিহাসিক নাটকসমূহ বিশেষ সার্থকতা দাবী করতে পারে। উত্তরকালীন লেখকদের প্রভাবিত করতে পারাই যে-কোন স্রষ্টা বা তাঁর সৃষ্টির পরম লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণেও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটকসমূহ অর্জন করেছে কালোত্তীর্ণ মহিমা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূল-গ্রন্থ

সিকান্দার আবু জাফর ১৯৬৫ : *সিরাজ-উ-দ্দৌলা,* ঢাকা : বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, সংস্করণ ১৯৯১

মুনীর চৌধুরী ১৯৬২ : *রক্তাক্ত প্রান্তর,* ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, সংস্করণ ১৯৭০

আসকার ইবনে শাইখ ১৯৫৭ : *রক্তপদ্ম,* ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, সংস্করণ ১৯৭০

১৯৫৯ : *অগ্নিগিরি,* ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৫৯

১৯৬৫ : *অনেক তারার হাতছানি,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫

সাঈদ আহমদ ১৯৮৯ : *শেষ নবাব,* ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৯

সৈয়দ শামসুল হক ১৯৮২ : *নূরলদীনের সারা জীবন,* ঢাকা : সব্যসাচী, ১৯৮২

মামুনুর রশীদ ১৯৯৭ : *লেবেদেফ,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

খ. সহায়ক-গ্রন্থ

অজিতকুমার ঘোষ : *বাংলা নাটকের ইতিহাস* (কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭০)।

অশীন দাশগুপ্ত : *ইতিহাস ও সাহিত্য* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৯)।

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান	:	*মুসলিমমানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: পাকিস্তান লেখক সংঘ, ১৯৬৪)।
আনিসুজ্জামান (সম্পাদক)	:	*মুনীর চৌধুরী রচনাবলী* – প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)।
আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	*বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* – প্রথম খণ্ড (কলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০)।
	:	*বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* – দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭১)।
কমলকুমার সান্যাল	:	*বাংলা নাটক সমীক্ষা* (কলকাতা : বর্ণালী, ১৯৭৬)।
নিখিলনাথ রায়	:	*মুর্শিদাবাদ-কাহিনী* (কলকাতা : কে. পি. বাগচী, ১৯৬২)।
নীলিমা ইব্রাহিম	:	*বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২)।
মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান	:	*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস সংস্করণ ১৯৮২)।
মুহম্মদ মজিরউদ্দীন	:	*বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা,* (রাজশাহী : নর্থবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭০)।
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদক)	:	*সাজাহান* (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, সংস্করণ ১৯৯৪)।
রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদক)	:	*বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক* (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ১৯৯৯)।
	:	*বাংলাদেশের নাট্যচর্চা* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৬)।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীশচন্দ্র দাশ	:	*সাহিত্য-সন্দর্শন* (ঢাকা : বর্ণবিচিত্রা, সংস্করণ ১৯৮৯)।
সাধনকুমার ভট্টাচার্য	:	*নাট্যতত্ত্ব-মীমাংসা* (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৬৩)।
সুকুমার বিশ্বাস	:	*বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮)।
সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী	:	*বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা* (কলকাতা : বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রকাশনী, ১৯৮১)।
হায়াৎ মামুদ	:	*গেরাসিম্ স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ্* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।
Earnest Ficher	:	*The Necessity of Art* (London : Penguin Books, 1976)।
Khan Sarwar Murshid	:	*Contemporary Bengali Writing : Bangladesh Period* (Dhaka : University Press Limited, 1996)।
Thomas E. Sanders	:	*The Discovery of Drama* (New York : Ann Arbor, 1968)।
Georg Lukacs	:	*The Historical Novel* (translated from the German by Hannah and Sanley Mitchel ; Boston : Charles Scribner's Sons, 1963)।

গ. সহায়ক-প্রবন্ধ

আলী যাকের	:	"নূরলদীনের সারা জীবন", *স্মরণিকা* – নাগরিকের ষষ্ঠদশ প্রযোজনা, ঢাকা, ১৯৮৩
বিশ্বজিৎ ঘোষ	:	"বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা (১৯৭১–১৯৯৫)", রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত *বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক* (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ১৯৯৮) শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

মলয় ভৌমিক	:	"লেবেদেফ প্রসঙ্গে", *নাটক : লেবেদেফ* শিরোনামের স্মরণিকা (সম্পাদক – শিরীন বকুল, ঢাকা, ১৯৯৭)।
সন্তোষ গুপ্ত	:	"লিয়েবেদেফ : ভারততত্ত্ববিদ না ভাগ্যান্বেষী", *নাটক : লেবেদেফ*, পূর্বোক্ত।
সুপ্রকাশ রায়	:	"রংপুরের বিদ্রোহ – ১৭৮৩", নাগরিকের ষষ্ঠদশ প্রযোজনার স্মরণিকা, পূর্বোক্ত।
হায়াৎ মামুদ	:	"লেবেদেফের মানস-ভূগোল", *নাটক : লেবেদেফ*, পূর্বোক্ত
Mamunur Rashid	:	"Bengali Drama and the Stage" in *Contemporary Bengali Writing* (Editor : Khan Sarwar Murshid), Dhaka : University Press Limited, 1996.
Zia Hyder	:	"Contemporary Theatre of Bangladesh" in *Contemporary Bengali Writing*, ibid.

.....